দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

আধুনিক কালনেমিদের নিয়ন্ত্রণে রামমন্দির মামলা

— পৃঃ ১৪

সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে বিরোধীরা

—পৃঃ ১৬

৭১ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।। ২৭ মাঘ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

রাহুলে ভরসা নেই তাই কি প্রিয়াঙ্কা ?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২৭ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১১ ফেব্রুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

চোরের মায়ের বড়ো গলা ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৬

খোলা চিঠি : সিপি-র ঘরে কী ধন আছে? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

আমেরিকা-নির্ভর বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন ▯ রীতেশ সিংহ ▯ ৮

নোটা প্রয়োগ করে দেশগঠন থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য ▯ ১১

আধুনিক কালনেমিদের নিয়ন্ত্রণে রামমন্দির মামলা ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৪

বিরোধীরা সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে অক্লেশে ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৬

সেকুলার আবহে ভারত ধর্মশালায় পরিণত হয়েছে ▯ বিরূপেশ দাস ▯ ১৮

চকচক করছেন, কিন্তু সোনা নন প্রিয়াঙ্কা ▯ পারুল মণ্ডল সিংহ ▯ ২৩

কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা প্রিয়াঙ্কাকে নেত্রী নির্বাচিত করেননি ▯ মিঠু চ্যাটার্জি ▯ ২৫

ম্যাজিক অটুট প্রমাণ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী ▯ আদিনাথ ব্রহ্ম ▯ ২৭

ভারতের প্রথম নাট্যকার অশ্বঘোষ ও নাট্য সম্রাজ্ঞী প্রভা ▯ অশোক কুমার দাস ▯ ৩১

মোশান মাস্টার মন্মথমোহন ▯ কণিকা দত্ত ▯ ৩৫

ধূপ-নৈবেদ্যর আড়ালে আজও যিনি ভাস্বর ▯ স্বামী অতীশানন্দ ▯ ৩৬

সমাজবাদী ঘরানার জাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৪৩

মালদহে কন্যাশ্রীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অবাধে বাল্যবিবাহ চলছে ▯ তরুণ কুমার পণ্ডিত ▯ ৪৫

ধর্ম ও বিজ্ঞান এবং শ্রীচৈতন্যদেব ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ —

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৭ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০▯ খেলা : ৪১ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন: ৪৬-৪৮ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মমতার নাটকে সাংবিধানিক সঙ্কট

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ধর্নায় বসেছিলেন। তাঁর দাবি, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই সিবিআইয়ের আধিকারিকরা পুলিশ কমিশনারের বাংলোয় সার্চ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা হলো, সিবিআই আধিকারিকেরা গিয়েছিলেন স্রেফ জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তাও তিনবার শমন পাঠিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর না পেয়ে। এর জবাবে পুলিশ সিবিআই কর্তাদের গ্রেপ্তার করেছে। আর মমতা? তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলে সংবিধান বাঁচানোর নামে ধর্নামঞ্চে নাটক করতে নেমে পড়েছিলেন। অভূতপূর্ব সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় মমতার নাটক এবং তার ফলে তৈরি হওয়া সাংবিধানিক সংকট। লিখবেন সনাতন রায়, রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও চন্দ্রভানু ঘোষাল।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

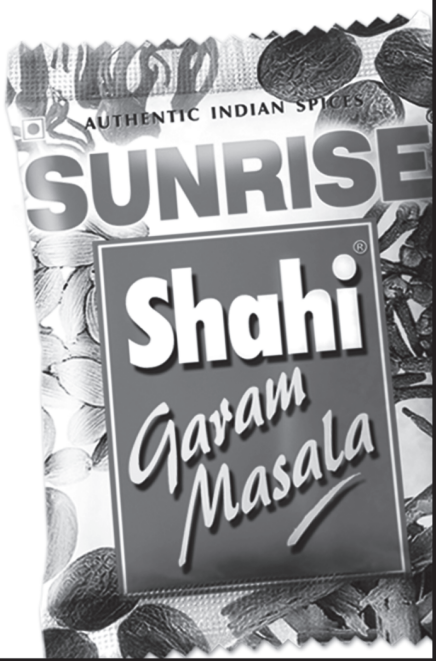

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গান্ধী ফ্যামিলি প্রাইভেট লিমিটেড

অবশেষে জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনে সরকারিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন সোনিয়া গান্ধী তনয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। ইতিপূর্বে নির্বাচনের সময় রায়বেরিলি এবং আমেথি কেন্দ্রে তাঁহাকে মাতা সোনিয়া এবং ভ্রাতা রাহুলের পাশে প্রচার লগ্নে হাস্যমুখে বিরাজ করিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সে আবির্ভাব নিতান্তই স্বল্প সময়ের জন্য। নির্বাচনী পর্ব মিটিতেই তিনি আবার অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। এইবারে তাঁহার প্রকাশটি অবশ্য অন্যরকম। মাতা ও ভ্রাতার উদ্যোগে তিনি এইবার জাতীয় কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ঘোষণা করিয়াছেন, ভগিনী প্রিয়াঙ্কাকে পূর্ব উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে এই সাংগঠনিক দায়িত্বটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করিয়া, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে যখন কংগ্রেস তাহার ডুবন্ত তরীটিকে একক প্রচেষ্টায় বাঁচাইতে নামিয়াছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশে যারপরনাই উৎফুল্ল হইয়াছে গান্ধী পরিবারের গুণমুগ্ধ কংগ্রেসি নেতা ও কর্মীরা। ইহাদের উৎফুল্ল হইবার একটিই মাত্র কারণ— প্রিয়াঙ্কাকে দেখিতে অনেকটাই তাহার পিতামহী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মতো। রাজনীতি অবশ্য নিছক সৌন্দর্য এবং মুখদর্শনীর উপর নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং প্রজ্ঞার উপরই ইহা নির্ভর করে। একথা অস্বীকার করা যাইবে না যে, প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং প্রজ্ঞায় এতাবৎকাল পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের এক অন্যতম অগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ। ফলে, এই প্রশ্নও উঠিবে যে, জাতীয় কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কি সেই রাজনৈতিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে? ইহার উত্তর এককথায়, না। তাহা হইলে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ কেন? এই ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বিচার্য হইয়াছে? বিচার্য হইয়াছে একটিই বিষয়—তাহা হইল তাঁহার ধমনীতে নেহরু-গান্ধী পরিবারের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রমাণ করিয়াছেন, কংগ্রেসে সর্বোচ্চ দায়িত্ব লাভ করিতে গেলে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র ধমনীতে নেহরু-গান্ধী পরিবারের রক্ত প্রবাহিত হইলেই যথেষ্ট।

জাতীয় কংগ্রেস প্রিয়াঙ্কাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দয়িত্ব অর্পণ করিয়া রাজনীতিতে আনিয়াছে। কংগ্রেসের আশা, লোকসভা নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কার মুখদর্শনী কংগ্রেসের ভোটের ঝুলি ভরিয়া দিবে। উল্লেখ থাকে যে, বিগত লোকসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর মুখদর্শনী কংগ্রেসের ভোটের ঝুলি ভরিতে পারে নাই। সদ্য সমাপ্ত মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে রহুল গান্ধীর মুখদর্শনী অপেক্ষা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং শচীন পাইলটের পরিশ্রমের ফসলই কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়াছে। ফলে, এই প্রশ্ন উঠিবেই রাহুলের উপর আর বেশি ভরসা না করিয়াই কি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রিয়াঙ্কাকে রাজনীতির ক্রীড়াঙ্গনে হাজির করিয়াছে কংগ্রেস। কংগ্রেস যতটা ভাবিতেছে যে, প্রিয়াঙ্কা আসিয়া শেষ লগ্নে বাজিমাত করিয়া দিবেন—কংগ্রেসের সেই আশা অপূর্ণ থাকিলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এমনিতেই উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী এবং অখিলেশপ্রসাদ যাদবের জোটে কংগ্রেস নাই। তদুপরি, কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে ওই রাজ্যের ৮০টি লোকসভা আসনে তাহারা একক শক্তিতে লড়াই করিবে। এখন সেই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে প্রিয়াঙ্কাকে রাখিবার ফলে মায়াবতী এবং অখিলেশের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়াছে। বুয়া-ভাতিজার সহিত রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক নির্বাচনী রণাঙ্গণে তিক্ত হইলেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

প্রিয়াঙ্কা শেষ পর্যন্ত কংগেসের ঝুলি ভরিয়া দিতে পারিবেন কিনা তাহা ভবিষ্যৎ বলিবে। এখন এইটুকুই বলা যায়, প্রিয়াঙ্কা প্রমাণ করিয়াছেন কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে গান্ধী ফ্যামিলি প্রাইভেট লিমিটেড।

সুভাষিতম্

কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন চ।।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদি পাঠে মনোরঞ্জন করে সময় ব্যতীত করেন আর মূর্খেরা নিদ্রা অথবা কলহে কালাতিপাত করে।

চোরের মায়ের বড় গলা

ধীরেন দেবনাথ

একদা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কংগ্রেসি রাজত্বকালে 'বোফর্স' কামান কেলেঙ্কারি নিয়ে সারাদেশ হয়েছিল উত্তাল। বিরোধীরা দাবি করেছিলেন, 'বোফর্স' কামান ক্রয়ে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। এরই বিরুদ্ধে তখন দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়েছিল, ''গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়।'' রাজীব গান্ধী অধুনা প্রয়াত। তবুও বিরোধীরা 'বোফর্স' কেলেঙ্কারির কথা আজও ভোলেননি। তাঁরা কংগ্রেসের সমালোচনা করতে গিয়ে আজও 'বোফর্স' কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ তোলেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল বিজেপি স্বভাবতই সরব। তাই এর পাল্টা দিতে রাজীবপুত্র তথা কংগ্রেস সাম্রাজ্যের 'যুবরাজ' ও কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বহু চর্চিত— 'রাফাল' চুক্তিতে আর্থিক দুর্নীতির গন্ধ পেয়ে হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁর পরিচলিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সরব। সরবতা ও চিৎকার-চেঁচামেচি এতটাই প্রকট হয়েছে যে প্রতিদিনই নিয়ম করে 'মিডিয়া'র সামনে নানা অঙ্গভঙ্গি করে উগরে দিয়েছেন তাঁর ক্ষোভ, যা অশালীনই নয়—বালখিল্যসুলভ বলে মনে হয়েছে অনেকের কাছে। ইতিপূর্বেও তাঁর অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ জনতার একাংশের হাসির উদ্রেক ঘটিয়েছে। তবুও তিনি অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। বিগত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী জনসভায় 'রাফাল', 'রাফাল' বলে নৃত্য করেছেন এবং মোদি সরকারের করেছেন মুণ্ডুপাত। আর তাঁর সাগরেদরাও 'যুবরাজে'র বাঁশিতে ধরেছেন পোঁ, বাজিয়েছেন মিথ্যাচারের ভাঙা রেকর্ড। এখানে উল্লেখ্য, 'রাফাল' হচ্ছে এমন একটি অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান যা ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শুধু অত্যাবশ্যকই নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। কারণ এই বিমান একদিকে যেমন ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবে, তেমনি শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তান ও চীনকে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে। আর তাইতো ওই দুটি দেশ 'রাফাল'-এর ভয়ে থরহরিকম্প। রাহুল জানেন, 'রাফাল' চুক্তি প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁর সরকারকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যথেষ্ট 'ডিভিডেন্ড' দেবে, যা কংগ্রেসের পক্ষে হবে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শামিল। তাই ব্যক্তি মোদী ও সরকারের ভাবমূর্তি ও কৃতিত্বকে কালিমালিপ্ত করতে মোদীকে কটাক্ষ করে রাহুল প্রতিটি জনসভায় 'চৌকিদার চোর' বলে প্রচার করেছেন। এমনকী, 'রাফাল'কে টেনে নিয়ে গিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে। রাহুলজীর এতটাই আত্মপ্রত্যয় ছিল যে সুপ্রিম কোর্টে মোদী ও তাঁর সরকারের মুখ পুড়বেই পুড়বে, যা লোকসভা নির্বাচনে মোদীর দলকে করে ছাড়বে গোহারা। কিন্তু না। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে 'রাফাল' চুক্তিতে কোনো অনিয়ম হয়নি। ৩৬টি বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ আদালত দেখছে না। তাই 'রাফাল' চুক্তি নিয়ে তদন্তের এক্তিয়ারও তাদের নেই। কোনও ব্যক্তির ধারণার উপর ভিত্তি করে তদন্ত চলতে পারে না। তাছাড়া দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে আদালত কোনো মতামত জানাবে না।

কথায় বলে না, ''অতি চালাকের গলায় দড়ি!'' রাহুল গান্ধীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মোদীর মুখ পুড়তে গিয়ে পুড়েছে অতঃপর তাঁর মুখই। তবুও তিনি মোদীর বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়তে ভোলেননি। তিনি বলেছেন, ১৯-এ তাঁর দল ক্ষমতায় এলে 'রাফাল' চুক্তির তদন্ত হবে। কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের দেওয়া হবে শাস্তি। ভাবতে অবাক লাগে, যে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর রাজত্বেই ঘটেছিল জিপ কেলেঙ্কারি। অতঃপর প্রায় ছয় দশকের কংগ্রেস শাসনে ঘটেছে অসংখ্য আর্থিক দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, চোরাচুরি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। উল্লেখ্য, 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' মামলায় অভিযুক্ত রাহুল গান্ধী ও তাঁর মাতা সোনিয়া গান্ধী এখন মুক্ত রয়েছেন জামিনে। রাহুলের ভগ্নীপতি বঢরারও দুর্নীতিও পর্বতপ্রমাণ। অতপর রাহুল গান্ধীর কাছে প্রশ্ন, 'বোফর্স' দালাল কাত্রোচ্চি (সোনিয়া গান্ধীর আত্মীয়), ভোপাল দুর্ঘটনার নায়ক অ্যান্ডারসন, এশিয়ান গেমসের কর্তা লোলিত মোদী ভারত থেকে পালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কার রাজত্বে ও কাদের সহযোগিতায়? কয়েক হাজার কোটি টাকার 'টু-জি' স্পেকট্রাম' কেলেঙ্কারি হয়েছিল কার শাসনকালে? কংগ্রেসের শাসনকালে এবং কংগ্রেসিদের সহযোগিতায় নয় কী? ভারতের আকসাই চীনকে চীনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কে? আজকের অগ্নিগর্ভ কাশ্মীরের শাসনভার একদিন পাকপ্রেমী শেখ আবদুল্লার উপরে ন্যস্ত করেছিলেন কে? পণ্ডিত নেহরু নন কি? তাই চুরি, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারির কলঙ্কে কলঙ্কিত দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসের কাণ্ডারি রাহুল মোদীকে 'চোর' বলেন কোন মুখে? এতো দেখছি,— 'চোরের মায়ের বড়ো গলা!' ■

সিপির ঘরে কী ধন আছে?

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

দিদির বড়ো অসময়। দলের লোকেরাও ভুল বুঝছে। দিদি বিক্ষোভ করতে বলেছেন। সবাই রাস্তায় নেমে সেলফি তুলে ফেসবুকে দিয়েই বিক্ষোভ শেষ করতে চাইছেন। কারণ, বিরোধীরা দূরের কথা দিদির ভাইদের মনেই যে সন্দেহের প্রশ্ন। মমতা কী লুকোতে চইছেন? কাকে বাঁচাতে চাইছেন তিনি? কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে, নাকি নিজেকে? এই প্রশ্নগুলো বিরোধীদের নয়, তৃণমূল নেতা, কর্মী, সমর্থকদেরও। রবিবার সন্ধ্যায় যে ভাবে রাজীব কুমারের লাউডন স্ট্রিটের সরকারি বাসভবনের সামনে থেকে সিবিআই গোয়েন্দাদের ধরপাকড় করে থানায় তুলে নিয়ে যায় এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনায় বসেন— গোটা ঘটনাটাই যে নজিরবিহীন। এর আগে কখনও এমন ভাবে কোনও তদন্তকারী দলকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়নি। এসব কেন হচ্ছে! এর আগে দলের নেতাদের যখন সিবিআই একই মামলায় জেরা করেছে, গ্রেপ্তার করেছে, জেলে পুরেছে তখন তো দিদি এসব কিছু করেননি? তবে রাজীবের বেলায় এতকিছু কেন? তবে কি এবার দিদির ফেঁসে যাওয়ার পালা।

বাঁচাতে চাইছেন? কেন ধরনায় বসেছেন? কী লুকাতে চাইছেন? কুণাল ঘোষ, সৃঞ্জয় বসু, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস পাল, মদন মিত্রদের এর আগে চিটফান্ড মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলে গিয়েছেন। কিন্তু, আজ কেন মমতা ধরনায় বসলেন, প্রশ্ন তৃণমূলেই। রাজীব কুমারের কছে কী এমন তথ্য আছে, যা উদ্ধার করতে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি নিয়ে ওই বাড়িতে ঢুকে গেলেন! দিদি কি তবে কিছু সরিয়ে ফেললেন! কী আছে ওঁর কাছে যে, দিদি জান-প্রাণ এক করে দিচ্ছেন? তৃণমূলও এর জবাব চইছে।

শনিবার রাতে সিবিআই সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছিল, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিটফন্ড কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে সিবিআই। সেই খবর চাউর হতেই রবিবার সকালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানান, কমিশনার রাজীব কুমার পৃথিবীর সেরা অফিসারদের মধ্যে অন্যতম। সাত দিন ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন তিনি। তাঁর পাশে রাজ্য সরকার সবসময় আছে। মুখ্যমন্ত্রীর করা এই টুইটের পরেই প্রশ্ন ওঠে--- পুলিশ কমিশনারকে বাঁচানোর জন্য এত তগিদ কেন মুখ্যমন্ত্রীর? তৃণমূল নেতাদের বাঁচানোর জন্য তদন্তের ফাইল লোলাট করেছেন নাকি তিনি? যখন সিবিআই তদন্ত করছে, তখন বিনা কারণে কেন মুখ্যমন্ত্রী কমিশনারকে এত দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন?

কিন্তু সন্ধেয় অন্য কাণ্ড। রাজীব কুমারের বাড়ির বাইরে পৌঁছে যান ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট তথাগত বর্ধনের নেতৃত্বে সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। কিন্তু তাঁদের বাধা দেয় কলকাতা পুলিশ পরে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনেই সিবিআই গোয়েন্দাদের টেনে- হিঁচড়ে গাড়িতে তোলেন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল অফিসাররা। সিবিআই গোয়েন্দাদের নিয়ে যাওয়া হয় শেক্সপিয়র সরণি থানায়। এর পর পরই লাউডন স্ট্রিটে রাজীব কুমারের বাসভবনে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিজি আইনশৃঙ্খলা অনুজ শর্মা। পরে সেখানে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। কিন্তু কেন! বিস্ময় কাটছে না দিদি-ভক্ত ভাইদেরও।

কিন্তু তার আগে সিপি-র বাড়ির সামনে থেকে সিবিআই আধিকরিকদের যে ভাবে টেনে-হিঁচড়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় তুলে নিয়ে গেল কলকাতা পুলিশ, তা কার্যত নজিরবিহীন। যে ভাবে অপরাধীদের গোপন ডেরায় হান দিয়ে দাগি আসামিদের গর্দান ধরে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। ঠিক একই কায়দায় লাউডন স্ট্রিট থেকে সিবিআই আধিকারিকদের তোলে কলকাতা পুলিশ।

রাজীব কুমারের বাড়ির সামনে থেকে প্রথমে সিবিআই আধিকারিকদের একটি দল যায় পার্কস্ট্রিট থানায়। কিন্তু পরে জানতে পারে, সিপির বাড়ি শেক্সপিয়র থানার অধীনে পড়ে। সেখান থেকেই সিবিআই-এর ওই দলটি পৌঁছে যায় শেক্সপিয়র সরণি থনায়। তাঁরা ভিতরে ঢোকার পর দীর্ঘক্ষণ পরেও বাইরে না আসায় সন্দেহ জাগে অনেকেরই। এরপরই সন্ধে সাতটা নাগাদ লাউডন স্ট্রিট থেকে বাকি আধিকারিকদের তুলে নেয় কলকাতা পুলিশের বিশাল বহিনী। বাদ দেওয়া হয়নি ডিএসপি সিবিআই তথাগত বর্ধনকেও। কলার ধরে সিবিআই অফিসারদের গাড়িতে তোলে পুলিশ।

তৃণমূলনেত্রীর দাবি, সিবিআইকে দিয়ে বাংলাকে কবজা করতে চাইছে বিজেপি। রাজনৈতিক ভাবে পেরে উঠছে না, তাই সিবিআইকে হাতিয়ার করেছে। এবং শনিবার প্রধানমন্ত্রী বাংলায় সভা করে দিল্লি ফেরার পর থেকেই তা শুরু হয়েছে। গোটা ব্যপারটাই যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তা বোঝাতে মমতা বলেন, নরেন্দ্র মোদীকে এ ব্যাপারে সব বুদ্ধি দিচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সিবিআই তাঁর কথাতেই চলছে। আসলে তৃণমূল সারা দেশের বিরোধী নেতাদের নিয়ে ব্রিগেডে সভা করার পরই ভয় পেয়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী- অমিত শাহরা।

এই অঙ্কটাও মিলছে না তৃণমূল নেতাদের কাছে। তাদের প্রশ্ন আগেও তো সিবিআই নেতাদের জেরা করেছে, গ্রেপ্তার করেছে, জেলে পুরেছে। তখন তো দিদি এই ভাবে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তবে কি রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তারের পরে দিদি বড়ো মুশকিলে পড়বেন! দলটা থাকবে তো! পুলিশকে নিয়ে দিদি ধরনায় বসেছেন। তবে কি এটা রাজনৈতিক না প্রশাসনিক! কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

— **সুন্দর মৌলিক**

আমেরিকা নির্ভর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন

অতিথি কলম

রীতেশ সিংহ

চীনকে আটকানোর ব্যাপারে আমেরিকার ধাক্কা খাওয়া থেকে রাশিয়া ও ইরানকে বাগে আনার যুগপৎ ব্যর্থতা ভারত-সহ অন্যান্য অনেক দেশের ওপরই চাপ সৃষ্টির রাজনীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মার্কিন প্রশাসন ভারতকে রাশিয়ার অস্ত্র কিনতে নিষেধ করছে। একই সঙ্গে ইরান থেকে ভারতের তেল কেনাতেও তারা বাধা দিতে চায়। এমনকী চীনের সঙ্গে ভারতের কোনো বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনেও তাদের আপত্তি। রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে আবদ্ধ থেকে বিশ্ব জিডিপি-র ২৫ শতাংশ, সামগ্রিক বিশ্ববাণিজ্যের ৩০ শতাংশ ও ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট-এর ২৬ শতাংশ এই গোলার্ধে টেনে আনে সেখানেও তারা নাক গলাতে চাইছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় নির্যাসে প্রজ্ঞাবানরা বিধান দিচ্ছেন নতুন 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' আবহে বিশ্বের চলতি 'সুপার পাওয়ারের' পাশে থাকাই বিধেয়। সুপার পাওয়ারের সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার কিন্তু চীন। তাই উপদেশটি ঠিক কাজের কথা নয়। ভারতের কখনই ইরানের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ ঘটানো যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ভারতের ইরান থেকে তেল আমদানি বড়ো মাপের। একই ভাবে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিধর হতে রাশিয়ায় অস্ত্র সরবরাহের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই দেশগুলিতে এযাবৎ ভারত থেকে রপ্তানির পরিমাণ আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তাই এই বাজার ধরা ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী প্রকল্প— ছাবাহার বন্দর ও সংলগ্ন ৭ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর দক্ষিণ পরিবহণ করিডরের নির্মাণের ক্ষেত্রে ইরান ও রাশিয়ার সহযোগিতা জরুরি। এই যোগাযোগ পথ সমাপ্ত হলে কাস্পিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরান, আজেরবাইজান ও রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি অনেক কম দূরত্বের অর্থকরীভাবে সস্তার জলপথে পণ্যপরিবহণের রাস্তা খুলে যাবে। ফলে একদিকে শুধু রাশিয়া নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড ইত্যাদি) বাণিজ্য লোভনীয় ও সুগম হয়ে উঠতে পারে। ভারত বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বরাবর যে স্বাধীন অবস্থান নিয়ে চলেছে তা থেকে সরে দাঁড়াবার কোনো কারণ নেই। এই অবস্থান দেশের বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থ দীর্ঘ দিন ধরে রক্ষা করে আসছে।

সেই কারণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে কী কী লক্ষ্য সাধিত হতে পারে তা কিন্তু পরিষ্কার নয়। তাঁর কেবলমাত্র বেনিয়াগিরির মানসিকতা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের এক পা এগিয়ে দু'পা পেছিয়ে আসার নীতি দেখে বোঝা যায় যে তাঁর বাণিজ্যক্ষেত্র, প্রযুক্তি বা এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে চীনের সঙ্গে মতপার্থক্য সম্পর্কে নিজস্ব কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই। সঠিক কৌশল অবলম্বন করা তো দূরস্থান।

নিয়ে বিদেশনীতির পরিচালনা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাঁর দেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সহযোগী কানাডা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে একগুঁয়েমি করে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরিতে মোটেই আত্মবিশ্বাস জাগায় না। সর্বদা নিজের নিরাপত্তা মজবুত রাখার ভাবনায় বাণিজ্য চালানো ও দেশের অভিবাষণ নীতিতে এককাট্টা মনোভাব দীর্ঘমেয়াদে ভারতের বাণিজ্যিক স্বর্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই সূত্রে ভারতকে সর্বাধুনিক ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সংবলিত প্রযুক্তি সরবরাহেও তাঁর যথেষ্ট রক্ষণশীলতা রয়েছে। নজর করলে দেখা যাবে ট্রাম্পের জমানায় বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকার নিজেকেই সর্বশক্তিমান ধরে নিয়ে লাঠি ঘেরানো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম কানুনকে তোয়াক্কা না করা ভারতের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী।

মজার কথা, মার্কিন তরফে একপক্ষীয়ভাবে ইরানের ওপর নানারকম আন্তর্জাতিক নিষেধজ্ঞা জারি করার পরিণতিতে ইরান তার পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা হয়তো আদৌ কমাবে না, উল্টে প্রতিক্রিয়ায় সময় সম্ভারের ভাণ্ডার হয়তো আরও বৃদ্ধি পাবে। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের এক পা এগিয়ে দু'পা পেছিয়ে আসার নীতি দেখে বোঝা যায় যে তাঁর বাণিজ্যক্ষেত্র, প্রযুক্তি বা এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে চীনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোনো

স্বচ্ছ ধারণাই নেই। সঠিক কৌশল অবলম্বন করা তো দূরস্থান। আর, এশিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব প্রভাবকে দমিয়ে রাখতে গেলে আমেরিকার ভারতকে দরকার হবেই।

তাই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে ভারত এক্ষেত্রে নাচার। অবশ্য এর মানে এই নয় যে দিল্লি আমেরিকা বিষয়ে সুচিন্তিত ও সহযোগিতাপূর্ণ কোনো অবস্থান নেবে না। বরঞ্চ আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ যেমন চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা মেটাল স্ক্রাপের ওপর বাড়তি আমদানি শুল্ক— এগুলিকে আরও শিথিল করার কথা ভাবা যেতে পারে।

এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, চীন সর্বদাই চায় যাতে ভারত অর্থনৈতিক ও সামরিক কোনওভাবেই উন্নতির শিখরে না ওঠে। সেই কারণে প্রায়শই চীন পাকিস্তানকে নানাবিধ সাহায্য দিয়ে থাকে যতই না তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোক। অথচ ভারত চীন সীমান্ত বা বাণিজ্য সমস্যা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এত কিছু সত্ত্বেও ভারত কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে না। বিশেষ করে বাস্তবে ইউরোপের দেশগুলি যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যায় জর্জরিত আর আমেরিকা দৈনন্দিন ভিত্তিতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী হয়ে উঠছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে ভারতের দরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিরন্তর বৃদ্ধি যা হবে দ্রুততর। আগে আরসিইপি অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কথা উল্লেখিত হয়েছে সেই সুবাদে চীনের সঙ্গে ভারত তার আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বিপুলভাবে বাড়াবার সুযোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতকে ধৈর্যের সঙ্গে কূটনৈতিক পারদর্শিতাও দেখাতে হবে। চীন এখনও ভারতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে শিল্পোৎপাদনের উপাদান, যন্ত্রপাতি, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, বৈদ্যুতিন ও টেলিকম হার্ডওয়ার ও সোলার প্যানেল সরবরাহ করে থাকে। চীনের রপ্তানিকৃত টেলিকম

ইউরোপের দেশগুলি যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যায় জর্জরিত আর আমেরিকা দৈনন্দিন ভিত্তিতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংকীর্ণতাবাদী হয়ে উঠছে, এমন একটা পরিস্থিতিতে ভারতের দরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিরন্তর বৃদ্ধি যা হবে দ্রুততর।

যন্ত্রপাতিগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিয়ে আশঙ্কা ইতিমধ্যেই Cellular Operator Association of India দ্বারা অমূলক বলে ঘোষিত হয়েছে। অবশ্যই ভারত সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিপদ ও গোপনীয়তাকে বিসর্জন দেবে এটা আদৌ বলা হচ্ছে না। উল্টে বৈদ্যুতিন ও টেলিকম সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে যাতে অন্তর্দেশীয় কোনো ঝুঁকি না থেকে যায় তার মোকাবিলায় কড়াকড়ি করতেই পারে।

দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে দুই অঙ্কের জিডিপি বৃদ্ধি এবং একটি খোলা বাজার চালু রাখার নীতিই হবে ভারতের পক্ষে আদর্শ বিদেশ নীতি। আর এ কাজটা আদৌ কঠিন নয়, তার কারণ আমাদের ক্রমিক বৃদ্ধির পথের বাধাগুলি সবই অভ্যন্তরীণ অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, বিধি নিষেধের কড়াকড়ি, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা এখনও বহাল থাকায় ব্যবসা করার খরচা অনাবশ্যক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়ছেন লগ্নিকারীরা।

এই সূত্র ধরে ভারতকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে যে খমতিগুলো রয়ে গেছে যেমন চুক্তির (অর্থনৈতিক) বাস্তবায়ন, কর লাগু করার বিষয়ে নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত হার বলবৎ রাখা বা লগ্নিকারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার চুক্তি চালু করতে পারলে বিদেশি পুঁজির লগ্নিতে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটবে যা পক্ষন্তরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হবে। একটি দ্রুত উন্নতিশীল অর্থনীতির দেশ কী চীন কী আমেরিকা উভয়ের কাছেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি ক্ষেত্রে আকর্ষক হয়ে উঠবে। সেই নিরিখে দেশটি কোন শক্তিধরের দিকে ঝুঁকল এ নিয়ে কেউই মাথা ঘামাবে না। দিল্লির সে কারণে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থনীতির গতিমুখ ঠিক রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতকে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থকেই পাখির চোখ করে ইরান ও রাশিয়ার সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে আমেরিকার মতো মহাশক্তিধরা যাতে চটে না যায় তাও খেয়াল রাখা জরুরি। একইভাবে জাপানের মতো চীনের সঙ্গেও এক পঙ্‌ক্তিতে যোগ দিয়ে ডব্লুটিও (World Trade Organisation) থেকে বাড়তি সুবিধে আদায় করার বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে হাত পাকানো অভিজ্ঞদের চীনের সঙ্গে শুল্ক সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার আশু সমাধানের রাস্তা খোঁজা প্রয়োজন। কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় ভারতের সপ্রতিভতার প্রয়োজন এখন আগের থেকে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি দরকারি।

(লেখক একজন বাণিজ্যিক অর্থনীতিবিদ এবং ইন্দোনমিক্স বিষয়ে পরামর্শদাতা)

রম্যরচনা

নৈতিক জয়

পল্টু বাড়ি ফিরেছে। হাতে-মুখে কালি। সারা গায়ে ধুলো কাদা মাখা। পল্টুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন— কী রে পল্টু কী হয়েছিল?

পল্টু—আমি কাল বিল্টুর টিফিন বাক্স থেকে লুকিয়ে কলা চুরি করেছিলাম।

বাবা—তারপর?

পল্টু—কলা খেয়ে সেই খোসা ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

বাবা—তারপর?

পল্টু—সন্তু সেটা দেখে ফেলেছিল। ও গিয়ে মাস্টারমশাইকে বলল। মাস্টারমশাই ব্যাগ দেখতে চাইলেন। আমি দেখাচ্ছিলাম না।

বাবা—তারপর?

পল্টু—মাস্টারমশাই হেডস্যারকে জানালেন। হেডস্যার বললেন ব্যাগ দেখাতে। তখন ব্যাগ থেকে কলার খোসা বেরিয়ে পড়লো। মাস্টারমশাই ঠাস করে চড় মারলেন।

বাবা—পল্টু, এর পরও লজ্জা করল না?

পল্টু—কিন্তু বাবা, আমার তো নৈতিক জয় হয়েছে। আমাকে তো স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়নি।

উবাচ

"সিবিআই অফিসারদের শুধু কাজ করতে বাধাই দেওয়া হয়নি, তাঁদের অন্যায় ভাবে থানায় আটক রেখেও দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা নজিরবিহীন তো বটেই, সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক পরিকাঠামো যে বিপর্যস্ত, তার প্রমাণও।"

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাওয়া সিবিআই কর্তাদের গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে

"যদি কোনো অন্যায় না করে থাকেন তা হলে পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার সিবিআইকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?"

সোমেন মিত্র
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

সিবিআইয়ের সঙ্গে রাজীব কুমারের অসহযোগিতা প্রসঙ্গে

"সুদীপ্ত সেন একা পনেরো হাজার কোটি টাকা হজম করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমার অনুরোধ, ধরনা-টরনায় না বসে মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে সিবিআইকে সহযোগিতা করুন। অনুরোধ নির্বাচন কমিশনারের কাছেও। আপনারা বিষয়টা আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবুন।"

ভারতী ঘোষ
প্রাক্তন আইপিএস অফিসার

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মমতার ধরনা প্রসঙ্গে

"চিটফান্ডের লক্ষ লক্ষ আমানতকারীর কোটি কোটি টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।"

সূর্যকান্ত মিশ্র
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক

চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্তে বারবার বাধাদান প্রসঙ্গে

নোটা প্রয়োগ করে দেশগঠন থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়

দেবযানী ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নানা দলের রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি আর একটি সমান্তরাল প্রচারও দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হচ্ছে। তাহলো, নোটার প্রচার। কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আগে একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন নোটার তাৎপর্য। নোটা অর্থাৎ নন অব দ্যা অ্যাবাভ। অর্থাৎ যিনি তাঁর কেন্দ্রের প্রার্থীদের কাউকেই তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মনে করতে পারছেন না, তিনি চাইলে নোটাতে ভোট দিতে পারেন। নোটা আইন তৈরিই করা হয়েছিল এমন ভোটারদের কথা ভেবে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। নোটা ভোটের অন্য কোনো গুরুত্ব নেই। নোটা ভোটার তাঁর ভোটের মাধ্যমে দেশের সরকার গঠনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক, কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারবেন না। মনে করুন, কোনো কেন্দ্রে যদি ১০০ জন ভোটার ভোট দিয়ে থাকে এবং তার মধ্যে ৮০ জনও যদি নোটাতে ভোট দেয় তাহলেও বাকি ২০ জনের ভোটের ভিত্তিতেই সেই কেন্দ্রের প্রার্থী নির্বাচিত প্রার্থী হবে অর্থাৎ ওই ৮০টি ভোট কেবলমাত্র অগ্রাহ্য করা হবে। বাকি ২০টি ভোটের অধিকাংশ যে প্রার্থী পাবে, সেই হবে ওই কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রার্থী। নোটা আইনের প্রভিসন তাই।

অর্থাৎ যাঁরা নোটাতে ভোট দিতে বলছেন, তাঁরা মূলত মানুষকে নিজেদের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরে থাকতে বলছেন এবং চাইছেন মানুষ দেশ ও রাষ্ট্রগঠনে কোনো ভূমিকাই না নিক। তাঁরা চাইছেন মুষ্টিমেয় কিছু অল্পসংখ্যক লোকই দেশের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ করুন। কারণ বহু লোক যদি নোটাতে ভোট দেন তবে সেই ভোটগুলো সরকার গঠনে কোনও সাহায্য করবে না, ফলে যে কটি কমসংখ্যক ভোট নানা দলের মধ্যে ভাগ হবে, তার ভিত্তিতেই সরকার গঠন হবে।

এক কথায় বলতে গেলে নোটাওয়ালারা চাইছেন দেশের সাধারণ জনগণ মনের শান্তির জন্য ভোট দিক কিন্তু দেশ গঠনে তাদের ভোটের কোনো ভূমিকা না থাকুক। কিন্তু নোটা প্রচারকরা এমন চাইছেন কেন?

এর উত্তর পেতে গেলে কিছুটা বুঝতে হবে মানুষের নির্বাচনী মনস্তত্ত্ব। আমাদের দেশের লোক দেশের সরকারকে প্রতিপক্ষ ভাবে। সরকার মানে যে আমরাই, স্বাধীন গণতন্ত্রের এই মৌলিক ধারণাটিকে ধারণ করার ক্ষমতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে নেই আজও। হাজার বছরের পরাধীনতাই হয়তো তার কারণ। তাই স্বাধীন হলেও পরাধীনতার মানসিকতা বদলায়নি। সাধারণ লোক আজও নিজেদের প্রজা মনে করে। কংগ্রেস এই ধারণাকে বদলাতে দেয়নি।

এখন প্রশ্ন হলো— এর সঙ্গে নোটাতে ভোট চাইবার সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক আছে। নোটাওয়ালারা মানুষকে ভাবাতে চাইছে যে ''তোমরা কাউকে বা ভোট দেবে কেন? তোমাদের স্বার্থ কে দেখেছে? কোনো দলই তোমাদের কথা ভাবেনি। তাহলে তাদেরকে ক্ষমতা পাইয়ে দেওয়ার জন্য তোমরা ভোট দেবে কেন?'' আর নিজেদের অজান্তেই ভিতরে ভিতরে পরাধীন মানসিকতায় আচ্ছন্ন বহু ভারতবাসী হয়তো এদের বক্তব্যের সঙ্গে মনে মনে একমত হতেও পারেন। নোটাওয়ালাদের কথা শুনে তাঁরাও হয়তো ভাবতে পারেন যে ''সত্যিই তো, আমরা ভোট দেব কেন? আমরা দেশের থেকে কী পেয়েছি? আমাদের কথা কে ভাবে যে আমরা তাদের ভোট দিয়ে চেয়ারে বসাতে যাব?'' এই ভাবনা সরকরকে নিজের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করে ভাবতে না পারার ফলে আসে। দেশের সরকার দেশের সাধারণ জনগণের প্রতিপক্ষ ছিল। কিন্তু তা ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। আজকের ভারতবর্ষে সরকার মানে আমরাই। এমনকী সরকার যদি আমার পছন্দের দলের নাও হয়, তাহলেও সে সরকার আমারও। দল ও সরকার পৃথক সত্তা। দল আমার না হতেও পারে, কিন্তু সরকার আমার। আমরা আমাদের পছন্দ, অপছন্দ সরকারের কাছে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, দাবি করতে পারি, কিন্তু ভোট না দিয়ে বা নোটাতে ভোট দিয়ে নিজেকে প্রকৃতই 'কেউ না' বা গুরুত্বহীন করে তোলার মতো অবিমৃশ্যকারিতার কাজ মানুষ কেন করবেন? দেশের মানুষ যদি ইতিবাচক চিন্তা করেন, তাহলে নোটাতে ভোট দেওয়ার উস্কানি যারা দিচ্ছে তাদের অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করাই উচিত হবে। কিন্তু বহু মানুষ হয়তো এমনভাবে ভাবতে পারেন না।

নোটাওয়ালারা চায় ক্ষুব্ধ হয়ে বহু লোক যেন তাদের ভোট নোটায় দেয়। অর্থাৎ নোটাওয়লারা চায় কোনো রাজনৈতিক দলের কমিটেড ভোটাররা নির্দিষ্ট ছাড়া সাধারণ জনগণ দেশের সরকার গঠনে স্বেচ্ছায় কোনো ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত হোক। অর্থাৎ নিরপেক্ষ সাধারণ ভোটাররা, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি যাঁদের নিঃসংশয় আনুগত্য না থাকার কারণে যাঁরা খোলা চোখে সরকারের কাজ/ অকাজকে বিচার করতে সক্ষম, তাঁদের হিসেবের বাইরে রাখার উদ্দেশ্যেই নোটাওয়ালাদের সমস্ত অপপ্রয়াস।

কিন্তু সাধারণ ভোটারদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখতে চাওয়ার পিছনে নোটাওয়ালাদের আসল উদ্দেশ্য কী? এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে বিনা স্বার্থে নোটাওয়ালারা এই প্রচার চালাচ্ছে। এখন

দেশে চলছে এনডিএ সরকার। অর্থাৎ মানুষের আশা ভরসা, প্রত্যাশা যা কিছু তা স্বাভাবিক ভাবে বিজেপির প্রতিই থাকার কথা। আবার এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মনোভাব কাজ করলেও করবে বিজেপির বিরুদ্ধেই। অর্থাৎ এই নোটাওয়ালাদের আসল নিশানা বিজেপি। এরা বলতে চাইছে, 'বিজেপি তোমাদের জন্য যা যা করবে বলেছিল, তার কিছুই কি করেছে?' এ প্রশ্ন সরাসরি করা হলে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মুখে কোনো উত্তর জোগায় না। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অত সচেতন হয়ে ওঠেননি এখনও। তাঁরা হয়তো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছেন, আয়ুষ্মান ভারতের কভারেজ পেয়েছেন, বিনা পয়সায় উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস পেয়েছেন, উজালা যোজনায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, কিন্তু কী পেয়েছেন জিজ্ঞেস করলে হয়তো ভাববেন, 'সত্যিই তো, কী পেলাম?' তখন নোটাওয়ালারা তাদেরকে বোঝাবে যে যদি না-ই পেয়ে থাকেন, তাহলে ওদেরকে ভোট দেবেন কেন?

এখন যদি মনে হয় যে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মনোভাব তৈরি হয়ে থাকলে নোটাওয়ালারা যদি তাকে মূলধন করে বিজেপি-বিরোধী প্রচারই চালাতে চায়, তাহলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির হয়ে সরাসরি প্রচারই বা করছে না কেন? নোটাওয়ালারা তো সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই বয়কট করতে বলছে। তাহলে ওরা শুধু বিজেপি বিরোধী কী করে হয়?

বাস্তব হলো, নোটাওয়ালারা এটা বিলক্ষণ বুঝেছে যে কংগ্রেস ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলের প্রতিও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মনোভাব বিপুল পরিমাণে জমা হয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির হালহকিকত যা, তাতে মানুষ যদি বিজেপিকে ভরসা করতে না পারে, তবে কংগ্রেস বা অন্যান্য দলকে আরওই ভরসা করতে পারবে না। তাই নোটাওয়ালারা যদি সরাসরি বলত যে 'বিজেপিকে ভোট না দিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দাও বা কমিউনিস্টদের দাও', তাহলে ওদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা থাকত না। লোকে স্পষ্ট বুঝতে পারত যে ওরা হলো বিজেপি-বিরোধীদের প্রচার শাখা মাত্র।

কিন্তু নোটাওয়ালাদের আসল উদ্দেশ্য বিজেপির ভোট কাটা, এমন সন্দেহের সপক্ষে সরাসরি প্রমাণ কী? ভোট তো অন্য দলেরও কাটা যেতে পারে। তাহলে ক্ষতি একা বিজেপির কেন হবে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে নির্বাচনী পাটিগণিতের মধ্যে। এবং তার পাশাপাশি কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও জেডিএস যেভাবে ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর একত্রিত হয়ে সরকার গঠন করে ফেলল, সেই দৃষ্টিকোণটাও মাথায় রাখতে হবে।

বাস্তব হলো, যে কোনো কেন্দ্রে যাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, তাঁদের মাত্র ২০ শতাংশ ভোটার থাকেন যাঁরা কোনো না কোনো দলের কমিটেড ভোটার। এবং যে কোনো রাজ্যে এই কমিটেড ভোটারের মোট সংখ্যা সব দলেরই প্রায় তুল্যমূল্য থাকে। এ হলো একটি স্ট্যাটিসটিক্যাল সত্য। বাকি ৮০ শতাংশ ভোটাররাই হলেন, যাঁদেরকে বলে ফ্ল্যাক্কিং ভোটার, যাঁদের ভোট হয় ইস্যুভিত্তিক এবং তা সুইং করে। এঁদের ভোট মূলত যাদের দিকে যায়, নির্বাচনে তাদের ফলই ভালো হয়। মনে করা যাক, মধ্যপ্রদেশের কোনো একটি কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১০০, এদের মধ্যে, ধরা যাক, ৭০ জন ভোট দেবেন, অর্থাৎ ৭০ শতাংশ পোলিং হবে। বাস্তবে দেখা যায় যে এই ৭০ জনের ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৬ জনই হলেন ফ্ল্যাক্কিং ভোটার, যাঁরা কোন দলের জয়লাভ করার সম্ভাবনা সর্বাধিক তা অনুমান করার মাধ্যমে ভোট দেন। ৭০ জনের ২০ শতাংশ অর্থাৎ ১৪ জন হলো বিজেপি + কংগ্রেস + সিপিএম + বিএসপির সম্মিলিত কমিটেড ভোট। মধ্যপ্রদেশে গত ৩টি টার্ম যাবৎ সরকার যেহেতু বিজেপির, ফলে বিজেপির কমিটেড ভোটের সংখ্যা অন্যান্যদের থেকে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। ক্ষমতা বহু মানুষকে কাছে টানে। ধরা যাক ১৪ জনের মধ্যে হয়তো ৬/৭ জনই বিজেপির কমিটেড ভোট, ৩/৪ জন কংগ্রেসের, ২ জন বিএসপির, ১ জন এনসিপি, ১ জন সিপিএম, ১ জন সিপিআই (এম এল)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কমিটেড ভোটের ভিত্তিতে কিন্তু বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে খুব কিছু তফাত নেই। অর্থাৎ যদি ভোটের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র নানা দলের কমিটেড ভোটারদের মধ্যেই সীমিত করে দেওয়া যায়, তাহলে প্রতিযোগিতা হবে হাড্ডাহাড্ডি। কোনো কোনো কেন্দ্রে হয়তো দেখা যাবে কংগ্রেসের কমিটেড ভোট বিজেপির কমিটেড ভোটের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। ফ্ল্যাক্কিং ভোটাররা ভোট দিলে সেই কেন্দ্রে হয়তো কংগ্রেস জিততে পারত না, কিন্তু ফ্ল্যাক্কিং ভোটারদের যদি নোটাতে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করে তাদের ভোটিং পদ্ধতি থেকে বের করে দেওয়া যায়, তবে সেই সিট হয়তো কংগ্রেস জিতে নিতে পারবে।

অনুরূপভাবে এমনই কোনো আর একটা সিট হয়তো বিএসপি জিতে নেবে। কারণ সেই কেন্দ্রে হয়তো তাদের কমিটেড ভোট বেশি। এবং এইভাবে কংগ্রেস, বিএসপি ইত্যাদি দলের পক্ষে বেশ কিছু অতিরিক্ত সিট জিতে নেবে। কারণ সেই কেন্দ্রে হয়তো তাদের কমিটেড ভোট বেশি। এবং এইভাবে কংগ্রেস, বিএসপি, সিপিএম ইত্যাদি দলের পক্ষে বেশ কিছু অতিরিক্ত সিট জিতে নেওয়া সম্ভব হবে, যেটা যে কোনো কেন্দ্রের প্রায় ৮০ শতাংশ ফ্ল্যাক্কিং ভোটাররা যদি ভোটদান করেন, তাহলে সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সিটগুলি হয়তো নিশ্চিতভাবেই জিতবে বিজেপি। কংগ্রেস ও সহযোগীরা মিলে যদি বেশ কিছু সাধারণ মূলত নিরপেক্ষ ফ্ল্যাক্কিং ভোটারকে নোটার ফাঁদে ফেলে বেশ কিছু অতিরিক্ত সিট এইভাবে জিতে নিতে পারে, তাহলে নির্বাচনের পরে তারা কর্ণাটকের কায়দায় এককাট্টা হয়ে গিয়ে হাং-অ্যাসেম্বলির দিকে চলে যেতে পারবে। এবং বিজেপিকে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নিতে বাধাদান করতে পারবে।

তাছাড়া বিজেপি বিরোধী দলগুলির যদি প্রি-পোল জোট তৈরি হয়, তবে নিছক কমিটেড ভোটের সংখ্যার হিসেবে জোটের ভোট সংখ্যা বিজেপির কমিটেড সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার ফ্ল্যাক্কিং ভোটাররা জোটে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে একযোগে বাতিল করে দিতে পারে কেবলমাত্র তারা বিজেপিকে হারানোর

জন্য সুযোগসন্ধানী জোট তৈরি করেছে বলেই। সেই আশঙ্কায় হয়তো সাধারণ ভোটারদের নোটাতে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

নোটাতে ভোট দেওয়ার সুযোগ যদি না থাকে তাহলে একজন ভোটার ভোট দিতে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তুলনা করতে বাধ্য হন। সাধারণ ভাবে একজন সাধারণ ভোটার হয়তো কাউকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু ভোট দেওয়ার আগে তিনি ভাবতে বাধ্য হন যে কে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ। নোটাওয়ালারা মনে করে, সেক্ষেত্রে সেই ভোটারের মনে হতে পারে যে বিজেপি অন্য দলগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম খারাপ। স্বাভাবিক অবস্থায় যিনি বিজেপিকেও পছন্দ করেন না, তিনিও যখন নানা দলের মধ্যে তুলনা করতে বসেন তখন তাঁর ভোট বিজেপির বাক্সে আসার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এটাই নোটাওয়ালারা আটকাতে চায়। তাঁদের অকথিত বক্তব্য হলো, ''প্রয়োজনে কাউকে ভোট দেবেন না, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিজেপিকে ভোট দেবেন না''।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, কোনো কেন্দ্রের ৮০ শতাংশ ফ্ল্যাঙ্কিং ভোটারদের বেশিরভাগই বিজেপির পক্ষে তার নিশ্চয়তা কী? তাঁরা তো বিজেপি বিরোধীও তো হতে পারেন?

উত্তর হলো ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা, তাতে বহু ফ্ল্যাঙ্কিং ভোটারের কাছেই বিজেপি হলো 'মন্দের ভালো'। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসি রীতির দলগুলির প্রতি তাঁদের অনীহা আরও বেশি। জনগণের সেই মনোভাব লক্ষ্য করে এমন মনে করা অসঙ্গত নয় যে বেশিরভাগ ফ্ল্যাঙ্কিং ভোটারই হয় বিজেপির পক্ষে অথবা অন্তত সরাসরি বিজেপির বিপক্ষে নয়।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই যদি হয়, তাহলে নোটাওয়ালাদের প্রচারে এত গুরুত্ব দেওয়ারই বা কী আছে? ফ্ল্যাঙ্কিং ভোটাররা যদি বিজেপির পক্ষেই হয় তাহলে নোটাওয়ালারা কী বলল না বলল তাতে কী যায় আসে? তাঁরা তো বিজেপিকেই ভোট দেবেন, তাই না?

এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার আগে মনে রাখতে হবে যে, দেশে বর্তমানে চলছে বিজেপি সরকার। কংগ্রেস বা কংগ্রেস ঘরানার অন্য দলগুলি অধিকাংশ মানুষের পছন্দ নয়। আবার গত সাড়ে চার বছরে বিজেপির বিরুদ্ধেও জমা হয়েছে বেশ কিছু ক্ষোভ। তাহলে সেই ক্ষোভ তাঁরা প্রকাশ করবেন কী করে? এইখানেই তাঁদের সামনে একটি বিকল্প তুলে ধরছে নোটাওয়ালারা। কংগ্রেসের ওপর মানুষের চরম রাগ আছে জেনেই নোটাওয়ালারা ফ্ল্যাঙ্কিং ভোটারদের উস্কানি দিতে চাইছে যে, ''রাগ তো আপনাদের বিজেপির ওপরে আছে, তাহলে তাদেরকেই বা 'অপেক্ষাকৃত কম খারাপ' বলে নির্বাচন করবেন কেন? বরং নোটাতে ভোট দিন।''

অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী প্রচার ও নোটাওয়ালাদের প্রচারের ফলে, কিছু ফ্ল্যাঙ্কিং ভোটার, যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন, তাঁরা যদি শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে নোটাতে ভোট দেন তাহলে কী হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের ফলাফলে পাওয়া গেল। নোটাতে ভোট পড়ার ফলে প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছিল হাড্ডাহাড্ডি কারণ কমিটেড ভোটার সব দলেরই থাকে প্রায় সমান সংখ্যায়। এবং অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না যে এই নোটাওয়ালারা আসলে কংগ্রেস ও সহযোগী দলগুলির একটা প্রচারশাখা মাত্র যারা নোটার নাম করে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে বিজেপির ও দেশের সাধারণ জনগণের দেশ গঠনের লড়াইটা আরও কঠিন করে দিতে চাইছে।

আরও একটা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ না করলেই নয়। কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা মিলে বিজেপির বিরুদ্ধে এত প্রচার ও বিষোদ্গার করা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সহযোগী প্রচারশাখা হিসেবে নোটাওয়লাদেরকেও নামাতে হয়েছে যেন তেন প্রকারেণ বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য। এ থেকে বিজেপির প্রতি এই প্রবল ভ্রষ্টাচারী ও দেশবিরোধী জোট রাজনীতিকদের একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ই প্রকাশ পাচ্ছে না কি? এও কি বিজেপির একপ্রকার জয়ই নয়?

স্বাধীনতার ৭১ বছর পর সাধারণ মানুষকে নোটতে ভোট দিতে বলার মধ্যে দিয়ে নোটাওয়ালারা পরোক্ষ প্রমাণ করে দিল যে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে সাধারণ নিরপেক্ষ ভোটার ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এত দিনের কংগ্রেস আমলে যা হয়নি, নরেন্দ্র মোদীর এনডিএ সরকারের সাড়ে চার বছরেই প্রকাশ পেয়েছে গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি। গণতন্ত্রের মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে অজস্র ধন্যবাদ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, স্বাধীনতার ৭১ বছর পরে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ২০১৯-এ এবং তার পরেও নরেন্দ্র মোদীর বিজয়ে যেন সেই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়।

সাধারণ নিরপেক্ষ ভোটারের উচিত কোনো নেতিবাচক শক্তির অপপ্রয়াসকে সফল হতে না দিয়ে নিজের দেশ নিজের হাতে গড়া। নোটার বোতাম টিপে নিজেই নিজেকে গুরুত্বহীন ঘোষণা করার হঠকারিতা আশা করি কোনো বুদ্ধিমান মানুষ করতে চাইবেন না। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

আধুনিক কালনেমিদের নিয়ন্ত্রণে রামমন্দির মামলা

একলব্য রায়

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে উল্লেখ রয়েছে। এক সময় শুধু বিজেপি নয় রামমন্দিরের কথা যারা উচ্চারণ করেছে তাদের সাম্প্রদায়িক বলে একঘরে করে দেওয়াটাই ছিল ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম কৌশল। 'একঘরে' হিন্দু সংগঠনগুলির নিরন্তর প্রয়াসের ফলে এখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি দুটোই পাল্টে গেছে। এখন সরাসরি রামমন্দিরের বিরোধিতা করলে তার আশ্রয় যে ভারতীয় রাজনীতির ডাস্টবিনে হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মন্দিরের কথা বললে যাদের গায়ে ফোসকা পড়তো তারাই সাংবাদিক ডেকে লাইভ ক্যামেরা সামনে রেখে গেরুয়া পরে মন্দিরে যাচ্ছে পুজো দিচ্ছে। অতি ভক্তির ইমেজ গড়ে তুলতে বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণ করে ব্যাঙ্গাত্মক স্লোগান তুলছে 'মন্দির ওহি মানায়েঙ্গে লেকিন তারিখ নেহি বাতায়েঙ্গে'। কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে'। একদিকে অতিভক্তি, সাচ্চা হিন্দু আবার কারও খাঁটি ব্রাহ্মণ ইমেজ গড়ে তোলার মরিয়া প্রয়াস, আবার অন্য দিকে মন্দিরের বিরোধিতা করার জন্য রামায়ণের রাবণের মতো কালনেমিদের নামিয়ে মন্দির নির্মাণের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা, এটাই এখন ভারতের রাজনীতির ময়দানে নতুন খেলা। কারণ সেই ভয়, একবার মন্দির নির্মাণ হয়ে গেলে আর বিজেপিকে ঠেকানো সম্ভব হবে না। সুতরাং এই সংকটময় মুহূর্তে কালনেমিরাই ভরসা। যাই হোক, মূল বিষয়ে আসার আগে রামায়ণের কালনেমির অপকীর্তির উপর একবার আলোকপাত করে নেওয়া যাক।

শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্ছা গেছেন। গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী এনে লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব পড়ল মহাবীর হনুমানের উপর। রাবণ দেখলেন হনুমানকে বধ করে লক্ষ্মণকে মৃত্যু মুখে পাঠানোর এই একটা বড়ো সুযোগ। দায়িত্ব পড়ল মরিচপুত্র কালনেমির উপর। শর্ত দিলেন রাবণ। এই সুযোগে হনুমানকে বধ করতে পারলে অর্ধেক লঙ্কা আর না পারলে মৃত্যু। অর্থাৎ হয় ছক্কা, না হয় অক্কা। আদেশ পেয়ে কালনেমি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে গন্ধমাদনের পাশে এক জলাশয়ের ধারে মুহূর্তের মধ্যে এক আশ্রম নির্মাণ করে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে উচ্চস্বরে রামনাম জপ করতে লাগলেন। রামনাম শুনে হনুমান কাছে যেতেই সাধুবেশী কালনেমি জলাশয়ে স্নান করে বিশ্রামের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশল্যকরণী চিনিয়ে দিয়ে সহায়তা করার আশ্বাস দিলেন। হনুমান স্নান করতে রাজি হলেও বিশ্রাম করতে সম্মত হলেন না। কালনেমি আগে থেকেই ওই জলাশয়ের জলে এক ভয়ঙ্কর কুমির নামিয়ে রেখেছিল। হনুমান জলে নামতেই সেই ভয়ঙ্কর কুমির আক্রমণ করে বসে। শুরু হয় তুমুল লড়াই। অবশেষে হনুমানের হাতে কুমিররূপী অভিশপ্ত অপ্সরা মুক্তি লাভ করে হনুমানকে কালনেমির বিলম্ব করিয়ে লক্ষ্মণের প্রাণনাশের গোপন অভিসন্ধির কথা জানিয়ে দেয়। এরপর হনুমান কালনেমিকে এমন ভাবে ছুঁড়ে দেয় যে সে এসে ভরা মন্ত্রীসভার মাঝে রাবণের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। অবশ্য এ ব্যাপারে আরেকটি মত হলো হনুমান কালনেমিকে বেঁধে রেখে বিশল্যকরণী নিয়ে রওনা দেয়।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছে এর পেছনে রয়েছে ছদ্মবেশী আধুনিক কালনেমিদের গভীর ষড়যন্ত্র প্রসূত নিত্যনতুন কৌশল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চে দুই এক ভোটে দেওয়া রায়ের উপর সুপ্রিমকোর্টে শুনানি চলছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ বিতর্কিত স্থানে মন্দিরের অস্তিত্বের পক্ষে রায় দিলেও সরকার অধিগৃহীত ২.৭৭ একর জমি ভগবান রামলালা, নির্মোহী আখড়া ও সুন্নিওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলেছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট তিন পক্ষই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের সময় গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের উকিল তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা কপিল সিব্বাল অযোধ্যা মামলার শুনানি চলার সময় সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে জানিয়ে ছিলেন যাতে এই মামলার শুনানি লোকসভা উনিশের নির্বাচনের পর জুলাই মাসে করা হয়। কপিল সিব্বালরা অবশ্য এতটুকুতেই থেমে থাকেননি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার নামে ধমকানোর চেষ্টাও করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতির নজিরবিহীন

সাংবাদিক সম্মেলন ও একজন বিচারপতির মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলার প্রয়াস করেছেন। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং বামপন্থী দলগুলি লোকসভা এবং রাজ্যসভার ৭১ জন সাংসদের স্বাক্ষরিত ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছে আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু ২০১৮-র ২৪ এপ্রিল সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এছাড়াও কালনেমি প্রয়াসের নজির হিসেবে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সুপ্রিম কোর্টে প্রথমে অযোধ্যা মামলার সঙ্গে সম্পর্কহীন ১৯৯৪ সালের ইসমাইল ফারুকি মামলার রায়ের উপর শুনানির আবেদনের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছিল ইসলামে নমাজ পড়ার জন্য মসজিদ অপরিহার্য নয়। আদালত যখন এই আবেদনের উপর শুনানি করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন মন্দির বিরোধীরা বড়ো বেঞ্চে শুনানি করার দাবি জানায়। প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অবশ্য সেই দাবি খারিজ করে দেয়।

এর মধ্যে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র মিশ্র অবসর গ্রহণ করেন এবং এই মামলার শুনানির দায়িত্ব আসে নতুন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের উপর। আগের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৯ অক্টোবর ২০১৮ থেকে এই মামলার নিয়মিত শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাবাবেগকে আঘাত দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অজ্ঞাত কারণে এই মামলাকে অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে সরিয়ে দেয়। আদালত নতুন করে ২ জানুয়ারি ২০১৯ এই মামলার শুনানির জন্য নতুন বেঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। পরে আবার এই তারিখ পরিবর্তন করে ১০ জানুয়ারি করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৮ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে বিচারপতি ইউ ইউ ললিত, এস এ বোরা, এন ভি রমনা এবং ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই বিচারপতিদের নিয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে বেঞ্চ গঠনের ঘোষণার পরই সেটা নিয়ে আদালতে আবেদন করা যেত। কিন্তু ১০ জানুয়ারি শুনানি শুরু হতেই মামলার উপর আবার একবার নেমে এল কালনেমির ছায়া। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবী রাজিব ধাওয়ান আপত্তি তুললেন যে বিচারপতি ইউ ইউ ললিত উত্তরপ্রদেশের পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহের সুপ্রিম কোর্ট অবমাননা মামলার আইনজীবী হিসেবে মামলা (১৯৯৪) লড়ে ছিলেন। এই আপত্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ২৯ জানুয়ারি নতুন করে বেঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে ইউ ইউ ললিত কল্যাণ সিংহের পক্ষে অযোধ্যা মামলার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ফৌজদারী মামলায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে অযোধ্যা মামলার মতো একটি দেওয়ানি মামলায় বিচারপতি হিসেবে থাকতে কোনও সমস্যাই নেই। এরই মধ্যে অবশ্য গত ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়ে বলেছে, রামজন্মভূমিতে যে ৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল সেই জমি সরকারের হাতেই ন্যস্ত করা হোক।

অযোধ্যা মামলাটি এতটা বিলম্বিত করেই যে কালনেমিরা খুশি হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে এমন ভাবার বোধহয় কোনো কারণ নেই। এই মামলার নথি হিসেবে সংস্কৃত, গুরুমুখী, উর্দু, ফারসি ভাষার চব্বিশ হাজারেরও অধিক নথির অনুবাদের বিষয় নিয়েও জটিলতা তৈরির প্রয়াস হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার এই মামলার গতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৪ দিনের মধ্যে সমস্ত নথি অনুবাদ করিয়ে এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড তৈরি করে রেখেছেন। শোনা যাচ্ছে জটিলতা তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এই নিয়েও। বিভিন্ন অজুহাতে এই মামলা শুনানি বিলম্বিত হতে হতে পরোক্ষ ভাবে কপিল সিব্বালের উনিশের নির্বাচনের পরে এই মামলার রায় দেওয়ার আবেদন সাকার হওয়ার দিকে এগোচ্ছে এমন আশঙ্কার পরিবেশ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে।

বিভিন্ন অজুহাতে যারা এই মামলা বিলম্বিত করার প্রয়াস করছেন তারা যে অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের বিরোধী এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মন্দির বিরোধী গোষ্ঠী কোনো ভাবেই চায় না অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ হয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তি দৃঢ় হোক, মজবুত হোক। মামলার রায় যে মন্দির নির্মাণের পক্ষেই যাবে এরকম একটি ধারণাও মন্দির বিরোধীদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সভা সমিতি কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার চোখ রাখলে স্পষ্ট হবে যে মানুষ আধুনিক কালনেমিদের ছক সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করেছে। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা কেশব চন্দ্র গগৈয়ের পুত্র হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে সুপ্রিম কোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিপ্রায় নিয়ে। রামমন্দির নিয়ে নীরবতার পাশাপাশি শবরীমালা মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অতি তৎপরতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

রাজনীতি আসবে যাবে কিন্তু বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের মনে এই সমস্ত সংশয় যে দেশের সাংবিধানিক ভিত্তির পক্ষে বিপজ্জনক এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বোধহয় একমাত্র জনতা জনার্দনই পারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেশকে নতুন আলো দেখিয়ে ছল কপটদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে। রামায়ণের কালনেমি রাবণের আজ্ঞা পাওয়ার পর নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন এবং রাবণকেও রামের বিরোধিতা ছেড়ে সত্যের পথে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু যার পতন অনিবার্য তার কানে এই সমস্ত ধর্মের কথা ঢুকবে কেন?

■

বিরোধীরা সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে অক্লেশে

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

নীচের স্লোগানগুলি লক্ষ্য করুন :

'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশা আল্লা ইনশা আল্লা', 'কাশ্মীর কী আজাদি তক জং রহেগী জং রহেগী,' 'কিতনে আফজল মারোগে, ঘর ঘর সে আফজল নিকলেঙ্গে,' 'ভারতকো রগড়া দো', 'গীরতি হুয়ি দিওয়ারোকো এক ধাক্কা আওর দো'। জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিপথগামী ছাত্র এই স্লোগানগুলি দিয়েছিল ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ওই স্লোগান অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো পুলিশ পরীক্ষা করেছে নিয়ম মেনে, ফরেনসিক পরীক্ষার পর পুলিশ একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে যে ওই ভিডিয়ো ফুটেজ নকল নয়, সত্যকেই তুলে ধরেছে। 'ভারত কী বরবাদি তক্ জং রহেগী জং রহেগি' এমন কথা যারা বলে, তারা কি দেশদ্রোহী নয়? দিল্লি পুলিশ কানহাইয়া কুমার, উমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং তাদের সহযোগী কয়েকজন কাশ্মীরি ছাত্রর বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে। কিন্তু দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার ওই এফআইআর ব্লক করে রেখে দিয়েছে যাতে ওই রিপোর্ট আদালতে যেতে না পারে। কিন্তু আইন অনুযায়ী, সরকার অনন্তকাল ধরে এফআইআর আটকে রাখতে পারে না, খুব বেশি ৯০ দিন আটকে রাখতে পারে, তার বেশী নয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে ওই দেশদ্রোহীদের বাঁচাতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সমেত অনেকেই সচেষ্ট হয়েছেন। এটা পরিষ্কার সিউডো-সেকুলার লবি যথারীতি ভারত বিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এরা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বুরহান ওয়ানিকে হিরো বানিয়েছে, পার্লামেন্ট আক্রমণকারী আফজল গুরুকে শহিদ আখ্যা দিয়েছে, আফজল গুরুর ফাঁসির সাজাকে জুডিসিয়াল মার্ডার আখ্যা দিয়েছে। এরা কি ভারতে থাকার যোগ্য?

দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এই টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই শতাব্দী প্রাচীন দল গান্ধীজীর স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কানহাইয়া কুমার ও শেহলা রশিদকে। এরা রাষ্ট্রবিরোধী স্লেগান দিয়েছিল

আফজল গুরুর সমর্থনে কানহাইয়া কুমারের বিক্ষোভ।

জে এন ইউ-তে। কংগ্রসের কাছে এরা ব্রাত্য নয়, বরং সম্মাননীয় ব্যক্তি বিশেষ। মজার ব্যাপার হলো, এদের আমন্ত্রণ জানানোর ছ'ঘণ্টা বাদেই আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাহার করা হলো। ব্যপারটা হাস্যকর নয় কি? কংগ্রেস দল আজও দেশের অখণ্ডতা নষ্ট করার জন্য যারা সচেষ্ট, তাদের পাশে হাজির। এরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে অথচ ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করার বিরোধিতা এরা করেনি। মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি এই কংগ্রেস দল মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। কারণ দলের নেতদের গদিতে বসার তাড়া ছিল। এই দলের এখনকার এক নেতা মণিশংকর আইয়ার পাকিস্তানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্দেশ্যে গালি দিতে দ্বিধা করেন না, নিজের দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে নীচু দেখাবার জন্য পাকিস্তানের মতো একটি অগণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় মুখর হন। এসব দেখে, মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এদের দেশের প্রতি ভালোবাসা বিন্দুমাত্র নেই।

দিল্লি পুলিশ দু' হাজার পাতার চার্জশিট পেশ করেছে বিশদ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। টুকরে টুকরে গ্যাংদের বক্তৃতার টেপের ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয়েছে, দেখা গেছে কোনোটাই ভুয়া নয়। যেমনটা ওদের দাবিই ভুয়ো প্রমাণিত হয়েছে।

অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ই-মেল থেকে জানা গেছে যে, আফজল গুরুর সমর্থনে পোস্টারগুলির ডিজাইন সে নিজেই করেছিল। চার্জশিটে এটাও বলা হয়েছে যে অনির্বাণ 'ভারতের দ্বারা দখলীকৃত' কাশ্মীরকে স্বাধীন করতে হবে, একথা বলেছে ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে খেলাখুলি ভাবে। দুঃখের বিষয়, কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু এনজিও, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এই ছাত্রদের সমর্থনে আসরে নেমে পড়েছে। তারা বলছে ভারতের সকল নাগরিকের বাকস্বাধীনতা আছে। এই ছাত্রদের বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, এটা বরদাস্ত করা যায় না। কিছু মুসলমান স্কলার এটাও বলছে যে কানহাইয়া কুমার শ্রমিক- কৃষকের অধিকারের জন্য লড়াই করে, নারীর সশক্তিকরণের জন্য

আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, গরিবের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে, অতএব সে প্রকৃতপক্ষে একজন হিরো, মোটেই দেশদ্রোহী নয়।

ভারতের দুর্ভাগ্য, এই সিউডো-লিবারেল, সিউডো-সেকুলার লবি যথেষ্ট সম্পদশালী। এদের অর্থবল, লোকবল কোনোটাই কম নয়। যখন কাশ্মীর উপত্যকায় সেখানকার ভূমিপুত্র কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে কাশ্মীর উপত্যকাকে পণ্ডিতশূন্য করা হয় মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার মদতে, তখন এই লবি টুঁ শব্দ উচ্চারণ করেনি। অথচ কানহাইয়াদের দেশদ্রোহী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকারের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে দেখে এরা সরকারের বিরুদ্ধে গলা ফাটাচ্ছে। এদের একটাই অ্যাজেন্ডা— দেশে একটা অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করতে হবে, মোদী সরকারকে পর্যুদস্ত করতে হবে। এদের হিন্দু-বিরোধিতা আকাশচুম্বী। যদিও মোদী সরকারের স্লোগানই হচ্ছে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ', এবং এই সরকারের প্রায় পাঁচ বছরের কার্যকালে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, অথবা কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ কেউ দেখেনি, কেউ শোনেওনি। তা সত্ত্বেও এই লবি তাদের হিন্দুবিরোধী মাইন্ডসেট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই এরা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা গুলিয়ে ফেলেছে। সরকারের বিরোধিতা করতে হবে বলে এরা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে যাচ্ছে অক্লেশে। যার জন্য বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে ভারতের সমালোচনায় এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হন না, কৈলাশ, মানস সরোবর যাত্রার নাম করে চলে যান অন্যত্র। সেখানে গিয়ে গোপনে চীনা সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন, যখন নাকি ডোকলামে চীনা সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় সেনা সংঘর্ষে লিপ্ত। এটা কোন ধরনের দেশপ্রেম?

মিডিয়ার একটা বড়ো অংশ ওই সিউডো-সেকুলার লবির হয়ে কাজ করছে। কেরলের খ্রিস্টান ফাদার ফ্রাঙ্কো মুলাক্কাল যখন একজন নানকে বলাৎকার করেছেন বলে অভিযুক্ত হন, তখন সারাদেশে আলোড়ন উঠলেও ওই লবি কোনও সাড়াশব্দ করে না। নিপীড়িতা নান যখন

কানহাইয়া, উমর খলিদারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্লেনে যাতায়াত করে, ফাইভস্টার হোটেলে থাকে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এত টাকা অসছে কোথা থেকে? সাপ্লাই করছে কারা? বহির্ভারতের কোনও দেশ কী যুক্ত?

বৎসরাধিককাল ওই অত্যাচার সহ্য করার পর ভ্যাটিকানকে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হন, তখন উল্টে তাঁকেই শাস্তি দেওয়া হয়, ওই বিশপকে নয়। এই নানের সমর্থনে যখন অন্য চারজন নান প্রতিবাদে নামেন তখন তাঁদেরকেও চার্চ শাস্তি দেয়। নিপীড়িতা নান প্রথমদিকে কেরলের বিশপকে, দিল্লির বিশপকে এবং কার্ডিনালকে বিষয়টি লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন। কোনও সদুত্তর পাননি। অবশেষে ২০১৮ সালে লোকাল থানায় তিনি একটি এফআইআর দায়ের করেন। এরপরেই বিষয়টা জনসমক্ষে আসে। লবির তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষীরা এই ব্যাপারটির বিষয়ে কোনও নিন্দাসূচক বিবৃতি দেননি। তাদের প্রতিক্রিয়া যে সিলেক্টিভ, সেটা এখন সকলেই বুঝে গেছে। বলাৎকারী ধর্মগুরুটি যদি হিন্দু হতেন, তাহলে এই লবির চীৎকারে কান পাতা যেত না। এদের বিদেশে বসবাসকারী like-minded বন্ধুরাও 'গেল গেল' রব তুলত। 'ভারতে মেয়েরা নিরাপদ নয়', 'নারী-স্বাধীনতা নেই', 'বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে', 'গণতন্ত্র বিপন্ন' 'হিন্দু টেরর দেশটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে' ইত্যাদি প্রচার যেটা অহরহ চলেছে, সেটাই আরও জোরালো হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে বলাৎকারী একজন বিশপ এবং তার সমর্থনকারী ও রক্ষাকর্তা খ্রিস্টান চার্চ, সুতরাং লবি এক্ষেত্রে মৌনীবাবা হবেই। এরা ভুলে যায় যে চার্চের স্থান কিন্তু দেশের সংবিধানের ওপরে নয়। পুরস্কার ফেরত দেওয়া তথাকথিত সেলিব্রিটির দল এই ঘটনায় বিচলিত হয় না। হিউম্যান রাইটসওয়ালারাও টুঁ শব্দ উচ্চারণ করে না। এই সব মহামানব ও মানবীদের দ্বিচারিতা আজ আর কারও অজানা নয়।

কানহাইয়া, উমর খলিদারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্লেনে যাতায়াত করে, ফাইভস্টার হোটেলে থাকে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এত টাকা অসছে কোথা থেকে? সাপ্লাই করছে কারা? বহির্ভারতের কোনও কোনও দেশ কী যুক্ত?

ব্রিগেড সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে এদের নিয়ে আসা হয়? দেশবাসী কিন্তু সবই বুঝে গিয়েছে। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে 'স্বস্তিকা'র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

সেকুলার আবহে ভারত ধর্মশালায় পরিণত হয়েছে

বিরূপেশ দাস

স্বাধীনোত্তর ভারতে 'সেকুলার' শব্দটির চর্চার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ করা হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরে আহসান মঞ্জিলে মুসলিম লিগের জন্ম হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকেই মুসলমানরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে সচেতন ছিল। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি। একই দেশে দুই জাতির সহাবস্থান কখনই সম্ভব নয়। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দাবি দিন দিন জোরালো হয়ে উঠে। এই সত্যটা আজকের কংগ্রেসি নেতারা বেমালুম ভুলে গিয়ে ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় স্বাধীনতার পর থেকেই সেকুলার চর্চার প্রতি মনোনিবেশ করেন। 'সেকুলার' শব্দটির চয়নকর্তা স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। স্বাধীনতা পরবর্তী এই সেকুলার শব্দটির হাত ধরেই ভারতের রাজনীতি প্রবাহিত হতে থাকে। কংগ্রেস কমিউনিস্টদের হাত ধরে আজ তা প্রকটরূপ ধারণ করে ভারতকে আবার এক অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন করেছে।

আজ ভারতের বুকে সমস্ত সংবাদমাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যখন 'সেকুলারি' গুণকীর্তনে মত্ত তখন মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপির পরাজয়ে কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে পাকিস্তানের চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ পতাকা এবং প্রকাশ্যে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'আল্লাহ আকবরধ্বনি'তে তাদের কলম আর কাজ করে না। ভারতবর্ষের সেকুলারি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনো আগাম অশনি সংকেত ধরা পড়ে না। এই না হলে পাকিস্তান গর্ব ভরে বলতে পারে আমরা 'সেকুলার' আর ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা আমাদের বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কার এবং কাদের স্বার্থে এই সেকুলারি বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া কাজ করে চলেছে? তারা ভুলেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির ঘটনা স্মরণ করে না। বর্তমানে কাশ্মীরে কী ঘটনা ঘটছে? একদিকে কাশ্মীরে পকিস্তান লাগাতার জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে, অপরদিকে পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীরের অভ্যন্তরে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরি মুসলমান পাকিস্তানের অর্থপুষ্টে তাঁবেদার বানিয়ে কাশ্মীরি যুবক-যুবতীদের মগজধোলাই করে পাথরবাজ তৈরি করে সেনাবাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করছে। দিনদিন কাশ্মীরে ঘটে চলা এইসব অপকর্মের প্রতিরোধ শক্ত হাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার বাজারি সংবাদপত্র হেডলাইন লিখছে— কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর গুলিতে সাতজন নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল। এর নাম কি সুস্থ সাংবাদিকতা? ভাবুন পশ্চিমবঙ্গে যত সংবাদপত্র আছে সেইসব কাগজের মালিক সম্পাদক, এমনকী সাংবাদিককুল পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুকুলের এক এক জনের মধ্যে পড়ে। অথচ এরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুদের আক্রান্ত হওয়া নিয়ে তামাসার মতো কিছু একটা লিখে দায় সারেন। বাংলাদেশ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোট হয়, ভোট এলে বাংলাদেশের দুটি বৃহত্তম দল আওয়ামী লিগ ও বিএনপিকে সেকুলার সাজানোর একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দেয়। একটা খবর খুবই চালু আছে ভোটের কয়েকদিন আগে হাসিনার আওয়ামি লিগের সাঙ্গপাঙ্গরা শতশত মুসলমান মেয়েদের বোরখা ছেড়ে সধবা হিন্দুনারীর প্রতীক শাঁখা-সিঁদুর ও শাড়ি পরিয়ে মিছিলে হাজির করে ভারত তথা বিশ্বকে দেখায় বাংলাদেশে কত সুন্দর ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণ। এ ব্যাপারে খালেদার বিএনপি কমতি কিসের? দলের মাতব্বররা বহুসংখ্যক চাচাদের দাড়ি গোঁফ চাঁচিয়ে লুঙ্গি ছাড়িয়ে ধুতি আর পঞ্জাবি, কোথাও কোথাও আবার হাফহাতা ফুলহাতা শার্ট পরিয়ে ভোটের লাইনে হাজির করে আর এক ধরনের সেকুলারি ভাবনার প্রতিফলন ঘটায়। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূলের নেত্রী একাই একশো। মুসলমান নারীর সব আদব কায়দা উনি একাই রপ্ত করে সারা বছর বিভিন্ন মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ান। এর নাম বুঝি 'সেকুলার' ভাবনা? ধর্ম নিয়ে উপমহাদেশে কোন ধরনের তামাসা চলছে এনিয়ে কজন ভাবনা-চিন্তা করে? দ্বিজাতি তত্ত্বের দৌলতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে আমাদের স্বাধীনতা এল। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটালো আর অবশিষ্ট ভারতে হিন্দুস্থান নামটা 'সেকুলার' শব্দ বন্ধনীর ভিতর মুখ লুকালো। কোনো 'নেশন' তৈরি হলো না এবং এর জন্য আমাদের জাতীয়স্তরের নেতারা কোনো তাগিদ অনুভব করলো না। 'নেশন' ছাড়া একটা রাষ্ট্রের ভিত কতটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে তা প্রতিদিন প্রতিবেশী দেশের প্রতিনিয়ত জঙ্গিহানা এবং সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতকে আক্রমণ করা এবং অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারতকে দুর্বল করে দেওয়ার মধ্যেই অনুভব করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারতের সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা একবারে নিশ্চুপ। কী আশ্চর্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুহত্যার এবং হিন্দু মেয়েদের অপহরণ সর্বোপরি ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা প্রসঙ্গে আমাদের দেশের 'সেকুলারচর্চা'কারী বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিক নেতাদের নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। ইদানীং কতিপয় সেকুলারি বুদ্ধিজীবীর ভারতের মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ধুয়ো তুলে কলকাতার ধর্মতলার রাজপথে প্রকাশ্য গোমাংস ভক্ষণের প্রদর্শনী করে।

ওইসব বুদ্ধিজীবীর দল একবার ভেবে দেখেননি দ্বিজাতি তত্ত্বের ফাঁদে ফেলে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে কয়েক লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে এবং কয়েক কোটি মানুষকে তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছাড়া করে এপারে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল? দ্বিজতি তত্ত্বের দৌলতে খণ্ডিত ভারতে একপক্ষের অযৌক্তিক সমর্থনপুষ্ট তোষণকে 'সেকুলারজিম' বলা কতটা যৌক্তিকতা বহন করে তা ভাববার সময় এসেছে। ভারতে সেকুলার বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকদের এর জবাব দিতে হবে। ■

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু দরদি সরকার অবশ্য প্রয়োজন

পাকপন্থী ইসলামি ষড়যন্ত্র এবং আগ্রাসন থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে রক্ষা করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। একমাত্র হিন্দু দরদি এবং দেশপ্রেমী রাজনৈতিক ক্ষমতাই পারে এখানকার মাটি ও হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে। হিন্দুপ্রেমী এবং দেশপ্রেমী রাজনৈতিক দলকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনজাগরণ সৃষ্টি করে জন-অভ্যুত্থানে পরিণত করতে হবে। যখনই এইরূপ রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন হবে তখনই একমাত্র সম্ভব পাকপন্থী ইসলামি ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া। তবেই এই রাজ্য-সহ সকল ভারতবাসী সুরক্ষিত থাকবে।

এই মাটি এই দেশ আছে বলেই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, টিএমসি ও বিজেপি এবং আমরা সবাই আছি। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের যৌথ সহযোগিতায় মুসলমানদের পাকিস্তান উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তবুও ইসলামাবাদ বা ঢাকাতে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা পতাকা উড়াতে পারেনি। ওপারের কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। অতএব তাদেরও ভাববার সময় এসেছে। তাই সকল হিন্দু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত আবাসভূমি গঠনে হিন্দুপ্রেমী বীর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে গড়া ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসা খুবই সময়োপযোগী ও আবশ্যক।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা সংগঠিত ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে পূর্ববাংলার মাটিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে আজ পূর্ববাংলায় হিন্দুরা ক্ষয়িষ্ণু জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে যদি পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের হিন্দু বা দলগুলি সম প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করত, আজ তাহলে ওই দুই দেশের হিন্দুদের ওপর সকল অত্যাচার বা নিপীড়ন অবশ্যই বন্ধ হতো। সকল ক্রিয়ারই সমান বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় থাকে। এটাই স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী হিন্দু দরদি সরকার থাকলে এপার-ওপার সমগ্র বঙ্গদেশে হিন্দুজনগোষ্ঠী সুরক্ষিত থাকবে। আর তখনই পাকিস্তানপন্থীদের আগ্রাসন নিপাত যাবে। এই সময়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে হিন্দু জাগরণ কল্পে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানুষের মুখ থেকে বিজাতীয় স্লোগান মুছে জয়হিন্দ, ভারতমাতা কী জয় ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত করতে হবে চারদিক।

—**চন্দন কুমার রায়,**
পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক দলের দৌরাত্ম্য

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের রেজাল্ট প্রকাশ করা নিয়ে রাতের অন্ধকারে শাসকদলের নেতারা তাদের চিরাচরিত খেলা চালিয়ে যাচ্ছে মাসাধিক কাল ধরে। মাসাধিককাল আগে স্নাতক স্তরের পার্ট-১, পার্ট-২, পার্ট-৩'র রেজাল্ট বের হওয়ার পরে রাজনৈতিক নেতাদের দাবিতে রেজাল্ট প্রকাশ স্থগিত করে রাখা হয়। নামকেওয়াস্তে যে রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়। সত্যিকারের পাশ বলতে যা বোঝায় সেটা কেবলমাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। পাশ কোর্সের রেজাল্ট দূরের কথা, অনার্সেও ফেলের হার মাত্রাতিরিক্ত। ফেলের হার দেখে রাজনৈতিক নেতারা প্রমাদ গোনা শুরু করে। সামনেই লোকসভার নির্বাচন! গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদলেহনকারীদের নির্দেশ পাঠানো হয় অবিলম্বে রেজাল্ট প্রকাশ স্থগিত করে দেওয়ার জন্য। একমাস ধরে প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী চরম

অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। কলেজে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে আছে। শাসকদলের নির্দেশে রাতের অন্ধকারে ফেল করা ছাত্রদের পাশ করানোর কাজ করা হচ্ছে। আর কলেজগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডারা বলে বেড়াচ্ছে আমাদের সরকার সবাইকে পাশ করিয়ে দেবে, তাই ছাত্র-ছাত্রীরাও আন্দোলন না করে চুপ করে আছে। মাত্র মাসখানেক আগে অর্থাৎ সেশন শুরুর ৭ মাস পরেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে ৫ বার নতুন নতুন ভর্তির তারিখ ঘোষণা করেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে শিক্ষা সেশন অন্তত দেড় বছর পিছিয়ে যাবে।

অথচ সারা বছর ধরেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বলেন যে, ভর্তিতে অবৈধ টাকার লেনদেন তাঁরা বন্ধ করবেনই। তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাদের হাতে টাকা পয়সা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। চলতি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা ৫ দফায় ভর্তি হওয়ার পর এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনই পায়নি। তার চেয়েও বড়ো কথা ৮ মাস আগে স্নাতক স্তরের পরীক্ষা হয়ে গেলেও রেজাল্টই বের হচ্ছে না, আবার চলতি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন কবে হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। মালদা জেলার কলেজগুলোতে বেধড়ক টুকলি চলে। তার পরেও তীব্র ফেলের হার! অতীতে গোপাল মিশ্র উপাচার্য থাকাকালীন মালদহের কলেজগুলোতে সিসিটিভির নজরদারিতে পরীক্ষা সংঘঠিত হতো এবং টুকলির হার যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। বর্তমান উপাচার্য স্বাগত সেন রাজনৈতিক প্রভুদের কথানুযায়ী সিসিটিভি তুলে দিয়ে ব্যাপক গণ-টোকাটুকির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার নকল ব্যক্তিত্ব, রূঢ় ভাষা, শিষ্টাচার বর্জিত

আচরণ ও আত্মম্ভরিতা গোটা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষিয়ে তো দিয়েছেই উপরন্তু টুকলির মহান কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেসের সব গোষ্ঠীর নেতাদের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন।

কলেজগুলোতে পড়াশুনা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে অধ্যাপকদের অবসরের মেয়াদ ৬৫ বছর করে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাদেরও চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পদলেহনকারীদের এখন একটিই কাজ— তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাদের হাতে সময়ে সময়ে টাকাপয়সা তুলে দেওয়া। নইলে ৫ দফায় ভর্তি করার নতুন নতুন ফরমান শিক্ষামন্ত্রীর তরফে আসে কী করে।

—শুভ্র সান্যাল,
ইংরেজবাজার, মালদহ।

উনিশে বাইশ অসম্ভব নয়

সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব নাকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বাইশটি লোকসভা আসনের তালিকা পাঠিয়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ রাজ্যে সভা করতেও শুরু করেছেন। দুই থেকে বাইশ খুব কঠিন মনে হলেও অসম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো এখানে যখন পরিবর্তনের হাওয়া আসে তখন রাজনৈতিক পট একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যায়। বাহাত্তরে বামেরা ছিল প্রায় কুড়িটি আসনে আর সিংহ ভাগ আসনে ছিল কংগ্রেস। সাতাত্তরে বামেরা ক্ষমতায় আর কংগ্রেস সেই যে ক্ষমতাচ্যুত হলো আর তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ঠিক একইভাবে বর্তমান শাসক দলের লোকসভাতে আসন এক থেকে লাফিয়ে পাঁচ বছরে প্রায় উনিশ হয়। এখন পঁয়ত্রিশ বিধান সভাতেও আসন তিরিশের কাছাকাছি থেকে ক্ষমতাতে ফেরা। গত বিধানসভা ভোটে বামেদের মুখ্যমন্ত্রীও নিজের আসনে পরাজিত হন।

তাই রাজ্যে দুই থেকে বাইশ অসম্ভব নয় বিজেপির পক্ষে। তবে ততটা সহজ নয় এই পথ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরোধী ভোট একমুখী হলে পরিবর্তন দ্রুত হবে।

পঞ্চায়েত ভোটে কী হয়েছে সবাই জানে। মানুষ ভোট দিতে পারেনি। যেখানে পেরেছে সেখানে ভালো ফল হয়েছে। মুকুলবাবু ও দিলীপবাবুর মতো এত নিপুণ রাজ্য নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। স্থানীয় নেতা না থাকায় সাধারণ কর্মীদের পুলিশ বা শাসক দলের সন্ত্রাস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। দিলীপবাবু বা মুকুলবাবুর পক্ষে সারা রাজ্যের সাধারণ কর্মীদের দেখা সম্ভব নয়। এই দিকগুলি ঠিক করতে পারলে দিলীপবাবু ও মুকুলবাবুর নেতৃত্বেই রাজ্যে উনিশে বাইশ সম্ভব।

—পদ্মপ্রিয় পাল,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

দেশের স্বার্থেই সমান বিচারব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার

ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড সর্বদা ভারতীয় সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড ঘোষণা করে যে তারা দেশের প্রত্যেকটি জেলায় দারুল খাজা বা শরিয়ত আদালত খুলতে চায়। বোর্ডটির মতে এই আদালত সম্পূর্ণ সাংবিধানিক এবং এটা নাকি দেওয়ানি আদালতের সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিতর্কিত এই সংগঠনটির আরও দাবি এটা নাকি কোনো আদালত বা শরিয়ত আইন নয়। এটি 'দারুল কাজা' যেখানে একজন কাজি সমস্যা, অভাব অভিযোগ শুনে রায় দান করবেন। দারুল কাজা উভয় পক্ষের সম্মতিতেই মামলাটি হস্তক্ষেপ করবে এবং মামলাটিতে দেওয়ানি আদালতে চলে গেলে কাজি সেখানে হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে মুসলমান সম্প্রদায় এখন তাদের বিচার ব্যবস্থায় দেওয়ানি আইনের আর কোনো হস্তক্ষেপ চায় না। তাই উত্তর প্রদেশের ৪০টি শরিয়ত আদালতের ধাঁচে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় এরকম শরিয়া আদালত খুলতে বদ্ধপরিকর। এটা নাকি সংবিধান প্রদত্ত তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সংবিধনে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে ঠিকই কিন্তু এই স্বাধীনতা দেশের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কথা তো কোথাও উল্লেখ নেই। দেশের সুশিক্ষিত প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিও বিতর্কিত বিচার ব্যবস্থাটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে জম্মু কাশ্মীরের গ্র্যান্ড মুফতি কয়েক হাত এগিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন শরিয়া আদালত তৈরি করতে না দিলে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ তৈরি করে দেওয়া হোক। প্রায় ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর প্রকাশ্যে এইরূপ হুমকি দেশের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতের জন্য অবশ্যই অশনি সংকেত।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি উন্নত দেশে ধর্মের উর্ধ্বে উঠে একই আইন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন ফ্রান্সে কমন সিভিল কোড, ইংল্যান্ডে ইংলিশ কমন ল', আমরেকিায় ফেডারেল ল', জার্মানিতে সিভিল ল' সিস্টেম চালু আছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে ইউনিয়ন সিভিল কোড চালু করতেই হবে। নতুবা মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড-এর মতো ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন শুধু ধর্মের নামে দেশে আবার বিভাজন সৃষ্টি করবে এবং তিন তালাক, নিকাহ হালালা, বহু বিবাহের মতো কুসংস্কার প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে সমাজকে অন্ধকার পথে পরিচালিত করবে। তাই এই বিষাক্ত জড় উপরে ফেলাই শ্রেয়। আপনি যদি কখনও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যান তাহলে বর্ডারে একটি তথ্যফলক নজরে পড়লে দেখবেন লেখা আছে বড়ো করে, ''Our way, Not your way. Don't like it? Pack your bags and Leave"। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এবিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

—রঞ্জন কুমার দে,
সুকান্ত লেন, তারাপুর শিলচর।

সরোগেসি গরিব মহিলাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

সুতপা বসাক ভড়

অর্থের জন্য মানুষ কী না করে! এমনকী অন্যের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এবং জন্ম দেওয়া পর্যন্ত। পরিবর্তে গর্ভের ভাড়া হিসাবে একটি মোটা অঙ্কের টাকা ওই মহিলা পেয়ে থাকে, যে অন্যের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে। নবজাত শিশুটিকে জন্মের পর জন্মদাত্রীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ওই বিত্তবান মালিকের হাতে তুলে দিতে হয়। কী অদ্ভুত, অমানবিক ব্যবস্থা!

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভাড়ায় গর্ভধারণ সম্পর্কিত বিল লোকসভায় পাশ করিয়েছে। অনেকদিন ধরেই ভাড়ার গর্ভ বা সরোগেসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছিল। লেখিকা তথা সাংবাদিক পিংকি বিরানি এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, এইভাবে অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাচ্চা গর্ভে ধারণ করা ও জন্ম দেওয়া গরিব মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বহুদিন ধরে আমাদের দেশের মহিলাদের বোঝানো হচ্ছে যে, বেশি শিশুর জন্ম দিলে কী কী বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তা সত্ত্বেও সরোগেসির মাধ্যমে বেশি বাচ্চার জন্ম দেওয়ার প্রবণতা গরিব মহিলাদের মধ্যে বেড়ে চলেছে। যেসব দম্পতির সন্তান প্রয়োজন, তারা এই গরিব মহিলাদের মাধ্যমে সন্তান পেয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই নিজেদের বাচ্চা আছে; যেসব মানুষ বিয়ে করেনি, অথচ বাবা হওয়ার ইচ্ছে, তারাও সরোগেসির মাধ্যমে বাচ্চা পেয়ে যায়।

বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ একবার বলেছিলেন যে, যদি সন্তান মানুষ করতে হয়, তাহলে দত্তক সন্তান নেওয়া যেতে পারে। তাঁর বক্তব্যের যুক্তি আছে। কারণ যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু এই পৃথিবীতে এসেছে বা যারা অনাথ, এর ফলে তারা বাবা-মার স্নেহ পেতে পারে। এছাড়া, অনেক বিদেশি আমাদের দেশে সরোগেসির মাধ্যমে সন্তান নিতে আসেন। কারণ বিদেশে সরোগেসি খুবই ব্যয়বহুল। তবে মাতৃত্ব নিয়ে এই ব্যবসা মানসিকভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। একটি নবজাত শিশু, যে জন্মগ্রহণের পর নিজের মার বাৎসল্য এবং স্পর্শ চিনে নিতে পারে, কোলে নিলে শান্ত হয়ে যায়, তাকে জন্মের পরই অন্যের হাতে তুলে দিলে তার প্রতি অন্যায় করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, জন্মের পর মার স্নেহমমতার আশ্রয় থেকে যদি

শিশু বঞ্চিত হয়, তাহলে সেই শূন্যতা জীবনভর থেকে যায়। বয়স্কা মহিলারা পরম্পরাগত ভাবে এই সত্য জানেন। সেজন্য শিশুর জন্মের পরই তাকে মার হৃদয়ের কাছে শুইয়ে দেওয়া হয়, যাতে ওই পরিচিত হৃদয়ের গতি চিনতে পেরে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক কিছুই অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। সেজন্য ওই অর্থের সামনে জীবনের আবেগ-আন্তরিকতা অর্থহীন হয়ে যায়। গরিব মহিলাদের হিতের জন্য নানান সংগঠন এই অন্যায় সরোগেসি প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেই সংগঠনের মহিলারাই সরকারের আনা বিলের বিরোধিতা করছে। তাদের বক্তব্য, এটি তাদের অর্থোপার্জনের মাধ্যম এবং এর দ্বারা তারা তাদের সংসার এবং সন্তানদের প্রতিপালন করা হয়ে থাকে।

সরোগেসির মাধ্যমে গরিব মহিলারা কতটা শোষিত, বঞ্চিত হয়ে চলেছে, সেদিকে তাদের হুঁশ নেই। সরকার এইসব ব্যাপারে জোর দিয়েছে। এখন সরোগেসির মাধ্যমে মা হওয়া এবং শিশু পাওয়া সবকিছুই আইনের গণ্ডীর মধ্যে হবে, যাতে কেউ গরিব মহিলাদের ঠকাতে না পারে এবং তাদের গর্ভকে ব্যবসার জন্য ব্যবহার করতে না পারে।

তবে বিলটি রাজ্যসভা থেকে পাশ হওয়া প্রয়োজন। নতুন বিল অনুসারে, যে দম্পতি এইভাবে বাচ্চা চাইছে, তাকে সরোগেট মার নিকট আত্মীয় হতে হবে। তাদের বিয়ের অন্তত পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরি। এদের ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। স্ত্রীর বয়স ২৩-৫০ বছর এবং স্বামীর বয়স ২৬-৫৫ বছর হতে হবে। এদের মধ্যে দুজনই, অথবা একজন যে মা বা বাবা হতে সমর্থ নয়, তার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। বাচ্চা যদি মানসিকভাবে অসুস্থ, রোগগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী হয়, তবে ছাড় পাওয়া যেতে পারে। গর্ভভাড়া নিতে হলে, ওই মহিলার স্বাস্থ্যবিমা করানো অত্যাবশ্যক। এই বিলে কোন মহিলা সরোগেট-মা হতে পারে, সে বিষয়েও উল্লেখ আছে। ওই মহিলা বিবাহিত এবং তার নিজের সন্তান থাকতে হবে। তার বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। তার কাছে ডাক্তারের প্রমাণপত্র থাকতে হবে, যাতে স্পষ্ট লেখা থাকবে যে, সে সরোগেসির মাধ্যমে মা হতে পারে। সরোগেসির ব্যবসায়িক ব্যবহার প্রমাণ হলে কঠোর শাস্তির বিধান আছে। অন্তত পাঁচ বছরের কারাবাস এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

মাতৃত্ব একটি সুখকর অভিজ্ঞতা। শারীরিক এবং মানসিকভাবে সন্তানের সঙ্গে একটি অনির্বচনীয় যোগসূত্র। সেই মাতৃত্বের ব্যবসায়িক ব্যবহার সমাজ এবং দেশের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যপূর্ণ। সেজন্য আশা করা যায় যে, এখন কোনো গরিব মহিলার কেবলমাত্র আর্থিক অসংগতির জন্য এইভাবে গর্ভ কেনা-বেচার ব্যবসা অনেকটা কম হবে বা বন্ধ হবে। ▮

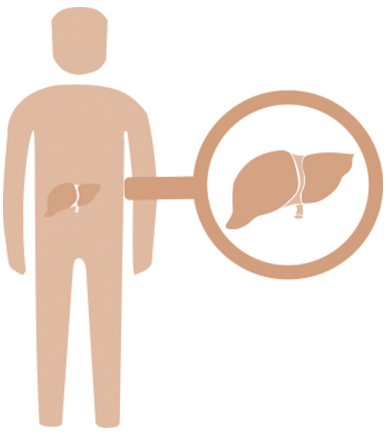

হেপাটাইটিস বি এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সম্প্রতি এ রাজ্যের বীরভূম জেলার জনসংখ্যা ভিত্তিক একটি স্টাডি করা হয়, দেখা গিয়েছে বীরভূমের জনসংখ্যার প্রায় ৩ শতাংশ মানুষই হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত, অথচ তাঁরা কেউ সেটা জানেনই না। এই ভাইরাস শরীরে নিয়ে ঘুরলে তা বোঝার উপায় নেই। যখন প্রকাশ পায় তখন হয়তো আর কিছু করার থাকে না। তাই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেওয়া থাক বা না থাক, সচেতনতা বৃদ্ধি আজও সমান জরুরি।

হেপাটাইটিস বি একরনের ভাইরাস। যা মূলত লিভারে সংক্রমণ তৈরি করে। হেপাটাইটিস এ.ই.সি. বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এদের মধ্যে হেপাটাইটিস ই ও এ ইনফেকশন ফিকো ওরাল রুট বা মুখের মাধ্যমে বাহিত হয়। লিভারে ইনফেকশন করে। সচরাচর দূষিত জল থেকেই এই সংক্রমণ শরীরে বাহিত হয়। অন্যদিকে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ রক্তবাহিত। তাই তা একজনের থেকে অন্যের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

উৎসস্থল : এই ভাইরাস জলবাহিত নয়, মূলত রক্তের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়ায়। সাধারণত মায়ের শরীর থেকে সদ্যোজাতর শরীরে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন অথবা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের (একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে রক্ত দেওয়ার মাধ্যমে) দ্বারা এই সংক্রমণ বাহিত হয়। পরিবারে কারও থাকলে তাঁর ব্যবহার করা ব্রাশ, দাড়ি কামানোর রেজার অন্যজন ব্যবহার করলে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

লক্ষণ-বিলক্ষণ : জন্মের পর মায়ের শরীরে হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন থাকলে তা থেকে সন্তানের শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। জীবন শুরুর দিকে যা কোনও-ভাবেই বোঝা সম্ভব নয় যে সেই শিশুর হেপাটাইটিস বি পজিটিভ। ২০-৩০ বছর পর হয়তো লিভারের কোনও সংক্রমণ থেকে ধরা পড়ে যে তার হেপাটাইটিস বি রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিভার সিরোসিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায় হেপাটাইটিস বি পজিটিভ ছিল। কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্ডিস নিয়েও এই সংক্রমণ প্রকাশ পায়। কিন্তু সবসময় যে জন্ডিস হবেই তা কিন্তু নয়। প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জ্বর, জন্ডিস, সর্দি-কাশি, পেটে ব্যথা হতে পারে। অন্যদিকে, ক্রনিক লক্ষণের তালিকায় রয়েছে লিভার সিরোসিস। অর্থাৎ রক্তবমি, কালো মল, পেটে জল জমা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মায়ের শরীর থেকে সংক্রমণ শিশু শরীরে হলে সেক্ষেত্রে লিভার সিরোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পায় ৩০-৪০ বছর বয়সের পর। কিন্তু যাঁরা প্রাপ্ত বয়সে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণে আক্রান্ত হন তাঁদের ক্ষেত্রে ২০ বছরের মধ্যেই লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

ভয়ের কারণ : একদিকে যেমন নির্দিষ্ট কোনও লক্ষণ নেই তেমনই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট বয়সও নেই। যে কোনও সময়েই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। হেপাটাইটিস বি শুধু যে জন্ডিস, লিভারে সংক্রমণ করে তা নয়। লিভার সিরোসিসের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। এই ভাইরাস থেকে লিভারে ক্যানসার হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। ক্যানসার নেই এমন ১০০ জনকে যদি প্রতি বছর লিভার ক্যান্সারের স্ক্রিনিং করা হয় তবে দেখা যায়, ২-৮ শতাংশ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি থেকে লিভার ক্যান্সারের সম্ভাবনা রয়েছে।

সচেতনতার সময় : হেপাটাইটিসে আক্রান্ত তা প্রাথমিকভাবে শুরুতেই বোঝার কোনো উপায় নেই। সাধারণত লিভারের কোনও সমস্যা বা অন্য কোনও সমস্যার দরুণ টেস্ট করতে গিয়ে তখন ধরা পড়ে হেপাটাইটিস বি পজিটিভ। তাই শারীরিক সম্পর্কে যাওয়ার আগে থ্যালাসেমিয়া, এইচ আইভি-র মতো হেপাটাইটিস বি টেস্ট করা জরুরি।

পজিটিভ টেস্ট : ২ বছরের ঊর্ধ্বে শিশু থেকে শুরু করে যে কোনও বয়সি, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেওয়া থাক বা না থাক একবার অন্তত 'হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন' টেস্ট করে দেখে নেওয়া উচিত। এই টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এলে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণে সে আক্রান্ত। অন্যদিকে এমনও হতে পারে জন্মের পর হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেওয়া রয়েছে কিন্তু তাও টেস্ট করে রিপোর্ট পজিটিভ আসতে পারে। একজন হেপাটাইটিসে একবার আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দিলে, সেই ভ্যাকসিন আর কাজ করে না। তাই এখন জন্মের পরই এই ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া হয়। তবুও দু'বছর বয়সের পর এই টেস্ট করা উচিত।

লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

(যোগাযোগ : ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩)

চকচক করছেন, কিন্তু সোনা নন প্রিয়াঙ্কা

পারুল মণ্ডল সিংহ

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'দূরের ঢোল শুনতে ভালো', কিন্তু কাছে গেলেই সেই ঢোলের বেসুরো আওয়াজ অসহ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনীতিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে আমরা এই প্রবাদের মিল খুঁজে পাই। গত ২৩ জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলেও, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে কিন্তু কংগ্রেস ভোটের আগে 'বিশেষ চমক' হিসাবে বহু আগে থেকেই ব্যবহার করছে। ভারতীয় রাজনীতিতে সেই বিশেষ চমকের কোনো গুরুত্বই না থাকলেও প্রত্যেক কংগ্রেস নেতা ও কার্যকর্তার কাছে তিনি দেবী ও প্রাতঃস্মরণীয়। কারণ? কারণ অবশ্যই তাঁর পদবি। বিবাহ পরবর্তীকালে ভারতীয় মহিলাদের পদবি পরিবর্তনের ভারতীয় পরম্পরাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি সর্বত্রই তার গান্ধী পদবি বহন করে বেড়ান। কংগ্রেসের নেতারা নাকি সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর পর প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মধ্যে তার ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর ছায়া দেখতে পান। তাঁরা আশা করেন যে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সারা দেশে যে ভরাডুবি হয়েছে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সেই ভরাডুবি থেকে কংগ্রেসকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু কংগ্রেস বুঝতে পারছে না যে ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর মতো চুলের স্টাইল বা শাড়ি পরার ধরন হুবহু নকল করলেও তার রাজনৈতিক প্রতিভা বা ব্যক্তিত্ব থেকে প্রিয়াঙ্কা বহু ক্রোশ দূরে রয়ে গেছেন।

এখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যতটুকু কাজ করেছেন তার থেকে তার বংশতালিকা বোধ করি বেশি লম্বা। তবুও রাজনীতিতে তার একটি ফ্ল্যাশ ব্যাক নেওয়া যাক। ইন্দিরা গান্ধীর জামানা থেকেই উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের দুর্গ আমেথি, রায়বেরিলি, সুলতানপুর ছাড়া বিশেষ কোনো অঞ্চলে কংগ্রেস তার এই স্টার প্রচারককে ব্যবহার করতে সাহস পায়নি, পাছে তার ম্যাজিক যে ফিকে তা প্রমাণ হয়ে যায়। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা তার মা সোনিয়া গান্ধীর লোকসভা কেন্দ্র আমেথি ও রায়বেরিলিতে কংগ্রেসের প্রচারের দায়িত্ব নেন। আমেথিতে এক সপ্তাহ থেকে প্রচার করেন। ভোটের ফলাফলের পর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাকে আবার দেখা যায় সেই আমেথি, রায়বেরিলি ও সুলতানপুরে। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন আমেথি কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন রাহুল গান্ধী। বিজেপি তার বিরুদ্ধে শ্রীমতী স্মৃতি ইরানিকে প্রার্থী হিসাবে নামিয়েছিল। অমেথিতে যে কংগ্রেসের যে কোনো একজন 'জি' প্রার্থী হবেন তা পূর্বনির্ধারিত হলেও বিজেপি কিন্তু প্রার্থী ঘোষণা করতে বেশ কিছুটা সময় নিয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে যখন স্মৃতি ইরানির নামের ঘোষণা হয় তখন নির্বাচন হতে আর একমাসও বাকি নেই। কিন্তু সেই এক মাসেও কম সময়ের মধ্যেই স্মৃতি ইরানি কংগ্রেসের দুর্গে রাহুল গান্ধীকে এমন চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন সে কংগ্রেসের 'ম্যাজিক' প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করতে বারে বারে আমেথিতে প্রচার করতে দেখা যায়। ঠাকুমার মতো সুতির শাড়ি পরে, আধভাঙা হিন্দিতে গ্রামের

> ভারতীয় সমাজ সিনেমার পর্দা নয় যে ঠাকুমার আদবকায়দা, পোশাক-পরিচ্ছেদ নকল করলেই সিনেমা হিট হয়ে যাবে।

লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে তাকে দেখা যায়। কিন্তু গ্রামবাসীদের ঠিক কী দুঃখের কথা তিনি শুনছিলেন তা আমাদের সেকু ও তথাকথিত মিডিয়া একবারও দেখায়নি। কারণ স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে আমেথিতে কংগ্রেসের রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন ওখানকার মানুষ এখনও এমন দুঃখে আছেন— এই প্রশ্ন কিন্তু কেউ তোলেনি। যাইহোক, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তার ভাই রাহুলের জয়টুকু রক্ষা করতে পারলেও সেখানে কংগ্রেসের ভোটে ধস নামে। কারণ ২০০৯ সালে আমেথিতে কংগ্রেসের ভোটের শতাংশ ছিল ৭১.৭৮, যেখানে বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৫.৮১ শতাংশ ভোট। বিজেপির প্রার্থী প্রদীপ কুমার সিংহ মাত্র ৩৭,৫৭০ ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর 'ম্যাজিক' একেবারেই ফিকে পড়ে যায়। কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ ৭১.৭৮ থেকে এক ঝটকায় ৪৬.৭১ শতাংশে নেমে আসে। যা গতবারের থেকে প্রায় ২৫.০৭ শতাংশ কম। আবার বিজেপির ভোট শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪.৩৮ শতাংশ যা গতবারের তুলনায় ২৮.৫৭ শতাংশের বেশি। সুতরাং একটু অঙ্ক কষলেই প্রমাণ করা যায় যে প্রিয়াঙ্কার ম্যাজিক একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। অবশ্য তার কাকিমা মেনকা গান্ধী এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অনেক আগেই করেছিলেন। তিনি মিডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তার ভাসুরঝি সম্পর্কে বলেছিলেন যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এখনও চুপ করে আছেন বলে তাকে আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যখন তিনি মুখ খুলবেন তখন তার নেতৃত্বের শূন্যতা, রাজনীতিক জ্ঞানহীনতা লোকেদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পূর্ব উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের দায়িত্ব পেলেও তিনি সেই দায়িত্ব নির্বাহ করতে কতটা সক্ষম হবেন তা কিন্তু বড় প্রশ্ন। কারণ পূর্ব উত্তরপ্রদেশের ৩০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২০১৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনও পায়নি। শুধুমাত্র গোরক্ষপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। তার উপর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মতো জনপ্রিয় ও বিশাল সাংগঠনিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা। এ তো গেল লোকসভা নির্বাচনের কথা। এমনকী বিধানসভা নির্বাচনেও ৪০৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৭টি আসন জয় করতে পেরেছিল। সুতরাং এক কথায় যোগীজীর মতো যোগ্য নেতা ও অসাধারণ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য প্রিয়াঙ্কা বঢরার তুলনা একেবারেই অকল্পনীয়। কারণ রাজনৈতিক প্রতিভা, সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা ও সর্বোপরি মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও আবেগকে বুঝতে গেলে একজন নেতাকে মনে-প্রাণে নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হয়, বহু বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কাজ করার অভিজ্ঞতা, মানুষের দরকারকে বোঝার অভিজ্ঞতা। যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মধ্যে একেবারেই নেই। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নিলেই রক্ত সূত্রে রাজনীতি কারোর মধ্যে আসে না। যেমনটা আসেনি রাজীবপুত্র রাহুলের মধ্যে। ভারতীয় সমাজ সিনেমার পর্দা নয় যে ঠাকুমার আদবকায়দা, পোশাক-পরিচ্ছেদ নকল করে ও কয়েকবার guest appearance দিলেই সিনেমা হিট হয়ে যাবে। এই ফর্মুলা রাজনীতিতে যে খাটে না, তা প্রিয়াঙ্কাকে বুঝতে হবে। আসল কথা কংগ্রেসের কাছে আর কোনো নেতা নেই যে কংগ্রেসকে এই ভরাডুবি থেকে উদ্ধার করে। তার উপর কংগ্রেস এতদিন পরও গান্ধী পরিবারের দাসবৃত্তি থেকে বাইরে আসতে রাজি নয়। অনেক রাজনীতিবিদই প্রিয়াঙ্কার সরাসরি রাজনীতিতে আসাটা একেবারেই একটি সাধারণ ঘটনা হিসাবেই দেখছেন। রাহুল গান্ধীর ব্যর্থতা ঢাকতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে শুধু ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও এই প্রথা ভারতীয় রাজনীতি ও ইতিহাসে একেবারেই অবাঞ্ছিত। একটা পরিবার দশকের পর দশক দেশের একটি অন্যতম মুখ্য দলের মাথা হয়ে থাকবে তা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এক বিপজ্জনক সংকেত। যা একেবারেই কাম্য নয়। এমনকী নিউইয়র্ক টাইমসও প্রিয়াঙ্কার ভারতীয় রাজনীতিতে আসাকে ব্যাখ্যা করেছে যে, 'প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাঁর পারিবারিক ব্যবসাতে যোগদান করেছেন।' যা অত্যন্ত অপমানজনক।

উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজবাদী পার্টির মধ্যে গঠবন্ধন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর দায়িত্ব ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস খোলাখুলি ভাবে এই গঠবন্ধনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাহলে কি কংগ্রেস পার্টির প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর রাজনৈতিক দক্ষতার উপর ভরসা নেই? তাহলে কেন তাকে দায়িত্ব দেওয়ার পরও কংগ্রেসের মতো জাতীয় দল আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে গঠবন্ধন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে গঠনবন্ধনের ফলাফলে সবাই ভুক্তভোগী। তাই উত্তরপ্রদেশের মতো প্রবল রাজনীতি সচেতন রাজ্যে প্রিয়াঙ্কার মতো পার্টটাইমার নেতা কোনো ম্যাজিকই যে করতে পারবেন না তা স্পষ্ট।

ভারতীয় সংস্কৃতি, জীবনধারা, চিন্তাধারা, দেশের ভালোর জন্য ঐকান্তিক চেষ্টার, মোট কথা মনেপ্রাণে দেশকে না ভালোবাসলে, দেশের মানুষের আবেগকে বুঝতে না শিখলে প্রখর রাজনৈতিক পারদর্শিতা না থাকলে রাজনীতির মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। যা এই মুহূর্তে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মধ্যে একটিও নেই। হিন্দিতে একটি প্রবাদ আছে, 'বনধ্ পিটারা লাখ কা, খুলে তো খাক কা'। বাক্স বন্ধ থাকলে মনে হয় তার ভিতর কী রত্নই না লুকিয়ে আছে, কিন্তু খুললেই বোঝা যায় যে ভিতর ছাই, অর্থাৎ কিছুই নেই। প্রবাদটি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভাবে খেটে যায়। ■

কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা প্রিয়াঙ্কাকে নেত্রী নির্বাচিত করেননি

মিঠু চ্যাটার্জি

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতবর্ষ ১০০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে আগামী পাঁচ বছরের জন্য তার নেতাকে নির্বাচিত করবে। এরই মধ্যে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের জাতীয় সম্পাদক রূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন রবার্ট বঢরার স্ত্রী তথা রাজীব ও সোনিয়া কন্যা এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। কংগ্রেসের তরফ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানোনো হয়েছে 'তিনিই হবেন কংগ্রেসের ট্রাম্প কার্ড।'

এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মধ্যপ্রদেশের সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সক্রিয় রাজনীতিতে আসা নেতা কর্মীদের আরও উৎসহ জোগাবে। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে দল যথেষ্ট অক্সিজেন পাবে বলে মনে করেন তিনি।

কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে।

প্রিয়াঙ্কা রাজনীতিতে নবাগত, পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কোনোদিনই তার কোনো যোগাযোগ ছিল না, আর তাই দেশের মাটির সঙ্গে যোগটাও নেই। মোটের ওপর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 'গান্ধী' পদবি ছাড়া রাজনীতির ওই উচ্চপদে বসার বাকি গুণাবলীর কোনোটিরই অস্তিত্ব নেই।

প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট বঢরাই বরং ছিলেন প্রচারের আলোতে --- বহু দুর্নীতির অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অভিযোগ রবার্টের সংস্থা স্কাইলাইট হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড জড়িত রাজস্থানের বিকানিরে বেআইনিভাবে ২৭৫ বিঘা জমি লেনদেনে।

অন্য একটি অভিযোগ, তৎকালীন হরিয়ানার কংগ্রেস সরকার অনেক কম দামে হরিয়ানার মানসে রবার্টকে জমি পেতে সাহায্য করেছিল। তারপর সেই জমি বিপুল দামে ডিএলএফ-কে বিক্রি করে বিশাল আর্থিক মুনাফা করেছিল রবার্ট।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছিলেন, ৩০০ কোটি টাকার বেশি বেআইনি অর্থ দিয়ে দিল্লিতে ৩১টি সম্পত্তি কিনেছেন প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট।

সম্প্রতি রবার্ট বঢরাকে ১২ ফেব্রুয়ারি ইডির সামনে হাজিরার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্ট!

যাইহোক, লিখতে গিয়ে মনে পড়ে

স্বামীর সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা।

স্বামী রবার্ট বঢ়রার দুর্নীতিকে কীভাবে লুকোবেন প্রিয়াঙ্কা

যাচ্ছে ২০০৯ সালে ২৪ এপ্রিল প্রিয়াঙ্কার একটি সাক্ষাৎকারের কথা, যেখানে প্রিয়াঙ্কা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, নিজের জীবন নিয়ে তিনি রীতিমতো খুশি ও রাজনীতিতে তিনি যেতে চান না। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত অনেক কিছুর সঙ্গেই তিনি খাপ খাওয়াতে পারেন না।

তবুও কেন এই 'অকাল অভিষেক'?

উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের কংগ্রেসের ইতিহাস ঘাঁটতে হবে।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কের সূচনা হয় তৎকালীন নামি ব্যারিস্টার মোতিলাল নেহরুর যোগদানের মাধ্যমে। মোতিলাল দুবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাবার দেখানো পথেই হাঁটেন মোতিলাল পুত্র দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হবার পরই ভারতে শুরু হলো নেহরুতন্ত্র। অর্থাৎ বলা যেতে পারে জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের শুরু।

নেহরু-কন্যা ইন্দিরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত তাঁর বাবার সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। নেহরুর মৃত্যুর পর প্রধনমন্ত্রী হন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৬৬ সালে তাঁরও মৃত্যু হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধী ভারতের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন— বহাল রইল পরিবারতন্ত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে রাজীবের মৃত্যুর পর তার ইতালীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী হন কংগ্রেস সভাপতি।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের উত্তরসূরি হিসেবে এই মুহূর্তে ভারতে রয়েছে দু'টি নাম— প্রথম জন যদি হয় রাহুল গান্ধী, তো দ্বিতীয় জন অবশ্যই প্রিয়াঙ্কা বঢরা। কংগ্রেস প্রথম বাজি রেখেছিল রাহুলের ওপর আর তাই তো কোনও নীতির তোয়াক্কা না করেই কংগ্রেস দলের সর্বময় কর্তা বানানো হয়েছিল। কিন্তু সভাপতি রাহুল গান্ধী দেশে ও বিদেশ সর্বত্রই বিভিন্ন সময় নিজের অপদার্থতা প্রমাণ করে চলেছেন। কংগ্রেস এটা ভালো করেই বুঝেছে নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দেবার মতো জোর রাহুলের কাঁধে নেই। আবার স্বাস্থ্যের কারণে সোনিয়া গান্ধীও হয়তো এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। অতএব পারিবারিক গড় রায়বেরিলি সামলাতে একমাত্র প্রিয়াঙ্কা ছাড়া কোনো গতি নেই সোনিয়া গান্ধীর পরিবারসর্বস্ব কংগ্রেসের। দলের প্রধান নিহত হলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি তৈরি হয়— আর দেশবাসীর এই সহানুভূতির ফায়দা তুলে চলেছে নেহরু গান্ধী পরিবার, ছিনে জোঁকের মতো জেঁকে বসতে পেরেছে নেহরু-গান্ধী পরিবারতন্ত্র।

জাতীয় কংগ্রেসের ৪৯ বছরের কেন্দ্রে সরকার গঠনের মধ্যে নেহরু গান্ধী পরিবারের সদস্যরাই বিভিন্ন সময় ৩৭ বছর ৩০৩ দিন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। পরিবারতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের লড়াইয়ে জাতীয় কংগ্রেসে বরাবরই পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়েছে।

২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে বিপর্যস্ত কংগ্রেসকে প্রিয়াঙ্কা নামক সঞ্জীবনী আশার নতুন আলো দেখাতে পারবে কি না, এই সিদ্ধান্তের ফল কী হবে, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। সর্বস্তরের সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে নিয়োগ করেননি। গান্ধী পরিবারতন্ত্র বজায় রাখার রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী তথা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কয়েক দশক ধরেই চলছে পরিবারতন্ত্র এবং তাকে কেন্দ্র করে মোসাহেবদের নির্লজ্জ চাটুকারিতা। সোনিয়া গান্ধী কিন্তু চাইলেই এখন গান্ধী পরিবারের বাইরে গিয়ে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারতেন। কারণ দল এখন সম্পূর্ণভাবে তাঁর একক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। কিন্তু সে পথে না হেঁটে পরিবারতন্ত্রের ধারাই বজায় রাখলেন তিনি।

যেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ বহু রক্তক্ষয়, বহু বলিদানের মধ্যে দিয়ে রাজতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেখানে এক ভয়ংকর উলট-পুরাণ হচ্ছে আমাদের দেশে। এ যেন কোনো এক অন্ধকার যুগের দিকে এগিয়ে চলেছি, যেখানে রাজার ছেলেই শুধু রাজা হয়, যেখানে মানুষকে বিশ্বাস করানো হয় 'নেতৃত্ব একটি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার'।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের শতাব্দী প্রাচীন দলটিতে পরিবারতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এগিয়ে চলছে অসীমের দিকে— এ এক উপহাসই বটে! গণতন্ত্র অবাধ হবে, যোগ্য নেতা-নেত্রীরা নির্বাচিত হবেন কর্মী-সমর্থকদের ভোটে— কারো একক নির্দেশে নয়, বংশ পরিচয়েও নয়— এই প্রত্যাশা রইলো। ■

ম্যাজিক অটুট প্রমাণ করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

আদিনাথ ব্রহ্ম

ম্যাজিক যে তাঁর বিন্দুমাত্র কমেনি— ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই রাজ্যে এসে ঠাকুরনগর এবং দুর্গাপুরের জনসভায় তা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদী। দুটি সমাবেশেই কয়েক লক্ষ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ প্রমাণ করেছে— আগামী লোকসভা নির্বাচনেও নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় মানুষ, অন্য আর কাউকে নয়। ঠাকুরনগরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার আয়োজক ছিল মতুয়া মহাসংঘ। এই মহাসংঘের সভাপতি শান্তনু ঠাকুর জনিয়েছেন, লোকসভায় নাগরিকত্ব বিল পাশ করে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের হিন্দু শরণার্থীদের জন্য যে নিরাপদ ভবিষ্যতের সূচনা করেছেন তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতেই এই সভা। ঠাকুরনগরের সভাকে কেন্দ্র করে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভিতর অসম্ভব উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে, এমনকী বাংলাদেশ থেকেও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা এসে আগের দিন থেকেই ঠাকুরনগরে ভিড় জমাতে শুরু করেন। কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড়ে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ঠাকুরনগর। প্রশাসনও ভিড় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়। অত্যধিক জনসমাগমের ফলে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ভাষণ সংক্ষিপ্ত করেন।

ঠাকুরনগরে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই যান মতুয়া সম্প্রদায়ের বড়োমা বীণাপাণি ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিছুক্ষণ সময় সেখানে কাটিয়েই সভাস্থলে আসেন প্রধানমন্ত্রী। ঠাকুরনগরের সভায় প্রধানমন্ত্রী গুরুচাঁদ-হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নাগরিকত্ব বিলের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। এই বিলের ফলে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হয়ে আসা মানুষজনের দীর্ঘদিনের দাবি যে পূরণ হবে— সেই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। বিলটির সমর্থনে সবাইকে, বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বাজেটের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঁচ একর পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জমির মালিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ছ' হাজার টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান জমা হবে। চাষিরা তা তিন কিস্তিতে দু' হাজার টাকা করে পাবেন।

দুর্গাপুরের জনসভাটির আয়োজক ছিল রাজ্য বিজেপি। এই জনসভার জনসমাগমকে জনপ্লাবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্বাভাবিকভাবেই জনসভার এই স্বতঃস্ফূর্ত ভিড় রাজ্য বিজেপি নেতা ও কর্মীদের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গাপুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আগাগোড়াই ছিলেন আক্রমণাত্মক। ঝাঁঝালো ভাষায় তৃণমূল কংগ্রেস সভনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমলোচনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল সরকারের বিদায় নিশ্চিত। বাংলায় পরিবর্তন হবেই। সভায় এত লোক দেখে এখন রাগে জ্বলছেন দিদি। বাংলায় পড়াশোনা করতে এখন ট্রিপল টি ট্যাক্স লাগে। অর্থাৎ তৃণমূল তোলাবাজি ট্যাক্স। কলেজ ভরতি, শিক্ষক বদলিতে ট্যাক্স দিতে হয়।

সিন্ডিকেট প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে এখন সিন্ডিকেট কালচার চলছে। জগাই-মাধাই সিন্ডিকেট চলছে। সারদা, নারদ, রোজভ্যালি মামলায় সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভুল না করলে অত চিন্তা কিসের? সিবিআই তো আমাকেও ন' ঘণ্টা জেরা করেছিল। সেই সময় কংগ্রেস সিবিআইকে চালাতো। আসলে মমতা ভয়ে আছেন। বিজেপির সভাপতি এলে উনি হেলিকপ্টার নামতে দেন না। কিন্তু আমাদের লড়াই জারি থাকবেই। জগাই-মাধাই সিন্ডিকেটের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করবই।

আয়ুষ্মান প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল সরকার মধ্যবিত্ত ও গরিবের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে। বিহার, ছত্তিশগড়ের সঙ্গে আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুবিধা বাংলাও পেয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার গরিবকে এই সুবিধা দিতেই রাজি নয়। কারণ, গরিবের মুখ থেকে মোদীর নাম বেরচ্ছে। তাই দিদির ঘুম চলে গিয়েছে। দুর্গাপুর এবং ঠাকুরনগর দু' জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মারধর করে তৃণমূল সমর্থকরা। কিন্তু মারধর উপেক্ষা করে শরীরে আঘাতের চিহ্ন নিয়েও অনেকে সভায় উপস্থিত হন। তা নজর এড়ায়নি প্রধানমন্ত্রীর। তিনি তাঁর ভাষণেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার করছে বর্ণনা করা যায় না। বিজেপি কর্মীদের এই আত্মবলিদান বিফলে যাবে না। প্রদীপ নেভার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে।

লিখে রাখুন, এদের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসছেই। ■

সোদপুরে মহিলা আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ বর্গ

দক্ষিণবঙ্গ আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সোদপুর গোশালায় গত ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর মহিলা আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ প্রমুখ ডাঃ মুরলী কৃষ্ণান, অখিল ভারতীয় হিসাব রক্ষক তপন বৈদ্য, প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ আশিস পাল, দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল প্রমুখ। প্রশিক্ষণ বর্গে দক্ষিণবঙ্গের ৮ টি জেলার ২০ টি গ্রাম থেকে ৫৫ জন মহিলা আরোগ্য মিত্র অংশগ্রহণ করেন। বর্গে সুস্থ জীবনশৈলী, ঘরোয়া উপাচার, প্রাথমিক চিকিৎসা, কিশোরী বিকাশ, মনোবিজ্ঞান, যোগানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দান করা হয়। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহপ্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায় এবং বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থা, কলকাতার অধ্যক্ষ ড. অভিজিৎ ঘোষ।

কলকাতায় খড়্গপুর আইআইটি বিজ্ঞান ও গবেষণা দপ্তরের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১ ফেব্রুয়ারি খড়্গপুর আইআইটি বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগ 'কমন রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হাব' বিষয়ে কলাকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে খড়্গপুর আইআইটি-র স্কুল অব মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-র প্রধান অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী এবং ভিজিটিং প্রফেসর ড. শতদল সাহা সাংবাদিকদের সঙ্গে

মত বিনিময় করেন। তাঁরা বলেন, খড়্গপুর আইআইটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির স্বার্থে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা দপ্তরের সহায়তায় এক প্রযুক্তি পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তুলতে চলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০০ শয্যা বিশিষ্ট যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে, তার পাশাপাশি এই প্রযুক্তি পরিষেবা কেন্দ্রটিও গড়ে উঠবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তার লক্ষ্যে কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এরফলে গ্রামাঞ্চলের আর্থিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটবে।

সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর জেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৭ জানুয়ারি সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর জেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। 'ওম্ নমঃ শিবায়' নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এক খুদে শিল্পী 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' সংগীতটি পরিবেশন করে। শেষে স্বল্প দৈর্ঘ্যের পৌরাণিক নাটক 'মহাভারতের মহাবিজয়' মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন দেবকুমার পণ্ডা, অর্ণব দাস, লহর মজুমদার, বিনয় সিদ্ধান্ত প্রমুখ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরে এবিভিপি-র ভারত গৌরব যাত্রা অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আন্তঃ রাজ্য ছাত্র জীবন দর্শনের অন্তর্গত গৌরব যাত্রার একটি দলের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ২৫ জানুয়ারি কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ বার্থ সেন্টিনারি হলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। সম্মাননীয় অতিথি রূপে ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেকটর রাজেশ পুরোহিত এবং বিশেষ অতিথি রূপে বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সহ সংগঠন সম্পাদক প্রফুল্ল আকান্ত উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের সুদূর বনাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকাগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাবে নিজেদের ভারতীয় ভাবতে পারত না। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ১৯৬৫ সালে 'স্টুডেন্টস ইন্টার স্টেট লিভিং' বা 'আন্তঃ রাজ্য ছাত্র জীবন দর্শন' নামে এক অভিযানের আয়োজন করে। অভিযানের অঙ্গস্বরূপ সেই প্রত্যন্ত এলাকার ১৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর ৫০ টি দলকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন পরিবারে রেখে একাত্মতার অনুভব করনো হয়। বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৪ বছরের সাধনায় আজ সেই এলাকার অধিবাসীরা আজ নিজেদের ভারতীয় বলতে গর্ব অনুভব করতে শিখেছে। এবছর এই গৌরব যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ থেকে ২৬ জানুয়ারি। ২০ দিনের যাত্রায় দেশের ৩ টি দল অংশগ্রহণ করে। দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম ও আন্দামান-নিকোবরের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দল কলকাতা থেকে যাত্রা করে ৭ জানুয়ারি বিজয়ওয়াড়া, হায়দরাবাদ, কন্যাকুমারী মুম্বই, রাইপুরে পৌঁছয়। কন্যাকুমারীতে তারা বিভিন্ন পরিবারে পোঙ্গল উৎসবে শামিল হয়। প্রতিটি স্থানেই তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

২৫ জানুয়ারি দলটি কলকাতায় ফিরে আসে। ভারতীয় জাদুঘরের প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যাত্রার সমাপ্তি হয়। মাননীয় রাজ্যপাল তাদের সবার সঙ্গে কথা বলেন এবং শুভেচ্ছা জানান।

বহরমপুরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দশম রাজ্য সম্মেলন

গত ২ ও ৩ জানুয়ারি মর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাশিমবাজার লাধুরাম তোষণিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দিরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দশম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অতুল কুমার বিশ্বাস উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল। সম্মেলন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১২০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে নতুন রাজ্য সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি —আশিস কুমার মণ্ডল (বাঁকুড়া), সম্পাদক— গৌরাঙ্গ দাস (কলকাতা), সংগঠন সম্পাদক— আলোক চট্টোপাধ্যায় (প্রচারক), ২ জন সহ সভাপতি, ২ জন যুগ্ম সম্পাদক,১ জন হিসাব রক্ষক, ২ জন মহিলা সদস্য সহ ২১ জনের

সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলনে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। সমাপ্তি ভাষণে তিনি ভারতের গুরু পরম্পরা ও ঐতিহ্যের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপন করে প্রত্যেক শিক্ষক বন্ধুকে তা অনুসরণ করার আহ্বান জানান এবং আমাদের রাষ্ট্রকে জ্ঞানের পীঠস্থান তথা পরাবিদ্যার ভিত্তিভূমি হিসেবে পুনর্গঠনের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন।

বালুরঘাটে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ১০ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির বালুরঘাট জয়চাঁদলাল প্রগতি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো।

শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক বাসুদেব পাল, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী কণিকা নন্দী, অমৃতা ঘোষ প্রমুখ। শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার সংস্কৃতভারতীর জয় সাহা। শিবিরে ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের চিঙ্গিশপুরে পরিবার প্রবোধন সম্মেলন

গত ৩ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চিঙ্গিশপুর মণ্ডলের আমরাইল সরস্বতী শিশুমন্দিরে পরিবার প্রবোধনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী পুষ্প মাহাতো সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন। এলাকার

১০ জন গৃহকর্তা ও ৭০ জন গৃহকর্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছে তা বিষদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন উত্তরবঙ্গ পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। সভা পরিচালনা করেন জেলা সহ সম্পর্ক প্রমুখ বিশ্বরঞ্জন সরকার।

ধর্মসংসদে শবরীমালার পরম্পরা রক্ষার বার্তা

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত হয়েছিল ধর্মসংসদ। আয়োজক ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত-সহ হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট সাধু ও সন্ন্যাসীরা। বক্তারা সকলেই কেরলের শবরীমালা মন্দিরে যে কোনও বয়েসের মহিলাদের প্রবেশাধিকারকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পরম্পরা রক্ষার ওপর জোর দেন। তাঁরা বলেন এই সংকট চার্চ ও ইসলামিক সংগঠন-সহ হিন্দুবিরোধী একাধিক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রিস্টানরা ১৯৫০ সালে শবরীমালা মন্দিরে আগুন লাগিয়ে বিগ্রহ নষ্ট করে দিয়েছিল। এরপর ১৯৮২ সালে একবার মন্দিরে খ্রিস্টীয় ক্রুশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, এবারও অসংখ্য মুসলমান মহিলা মানবপ্রাচীর গঠন করেছিলেন। রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের সুযোগ নিয়ে সাধারণ ভক্তদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। বক্তারা হিন্দু সংগঠনগুলিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ধন্যবাদ দেন।

ভারতের প্রথম নাট্যকার অশ্বঘোষ ও নাট্য সাম্রাজ্ঞী প্রভা

অশোক কুমার দাস

বর্তমান বিহার রাজ্যের মিথিলা জেলাটি দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশ নেপালে, দক্ষিণ অংশ ভারতবর্ষে। প্রাচীন ভারতবর্ষে মিথিলার সুমহান রাজা ছিলেন দেবরাজ। তাঁর মহান কীর্তির জন্য তাঁকে বলা হতো মহাদেবরাজ। তাঁর দুই সহধর্মিণীর জন্য দুটি রাজপুরী স্থাপন করেছিলেন। বড়রানিমা ধরিত্রীদেবী থাকতেন নবনির্মিত রাজপুরীতে। বর্তমান মিথিলা বিহারের মধুবনী জেলায় দামোদরপুর গ্রামে অবস্থিত বিশাল সরোবর তীরে তার ধ্বংসাবশেষ। মহাকবি কালিদাস যে কালীমন্দিরে বসে সাধনা করতেন এবং যে মহাদেবের মন্দিরে বসে গ্রন্থ রচনা করতেন তার ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তমান। দুটি রাজপুরীর দূরত্ব উত্তর দক্ষিণে প্রায় আশি কিলোমিটার। ছোটো রানিমা থাকতেন পুরাতন রাজপুরীতে। সেটি ছিল বর্তমান নেপাল রাজ্যে মিথিলায়। বর্তমান যেখানে জনক ঋষির আশ্রম তারই দক্ষিণ পার্শ্বের যে স্থানটিতে রাম-লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন বসে বিবাহ করেছিলেন সেই স্থানটি, নেপালের রাজা মহেন্দ্র প্রস্তর মূর্তিস্থাপন করেছেন তারই পার্শ্বদেশে। সম্ভবত তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রাজত্ব করতেন মহাদেবরাজ। ভারত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে রাজ্যটি অটুট রেখেছিলেন। এই মহাদেবরাজ ছিলেন ঋষি জনকের বংশধর। তখন ভারতবর্ষে সুবর্ণযুগ। সকলেই বসবাস করতেন আনন্দে সুখে শান্তিতে। এই সময় শিল্প সাহিত্য ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশলাভ করেছিল দৃশ্যকাব্যের যা বর্তমানে রূপলাভ করেছে পালাগান যাত্রা ও নাটকে। মূলত ভরত মুনিই দৃশ্যকাব্য এবং নাটক নিয়ে আসেন গ্রিসের রঙ্গমঞ্চ থেকে ভারতবর্ষে। মহিমান্বিত নাট্যচর্চার প্রাচীন ইতিহাস বর্তমান বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়েছে। বহু প্রাচীন পুঁথিতে তা যেমন লিপিবদ্ধ রয়েছে তেমনই মুখরিত হয়েছে কিংবদন্তী। দুঃখের বিষয়, সেগুলি বর্তমান সমাজের আলোয় আলোকিত করা হয়নি।

প্রাচীনকালে জনকপুর ছিল ভারতের তীর্থভূমি। ঋষি জনকের আশ্রমটি ছিল সাধনার পীঠস্থান। তাই গ্রিস ও মিশরের বহুমানুষ আসতেন তীর্থ দর্শনে। কেউ কেউ আসতেন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের টানে, মোক্ষলাভের আশায় সাধন ভজন করতে। জনক ঋষির পালিতা কন্যা সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হয়। নিজ কন্যার সঙ্গে লক্ষ্মণের, নিজ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যার সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। রাজা মহাদেবরাজের রাজপুরীটি যেমন ছিল সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তেমনই তাঁর আচার আচরণ ছিল মনোমুগ্ধকর। যা কিছু মঙ্গলদায়ক তা তিনি গ্রহণ করতেন অবিলম্বে। প্রজামঙ্গলের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করতেন তৎক্ষণাৎ। মিথিলায় বসবাসের জন্য তাই মিশর ও গ্রিসের বহু মানুষ এসেছিলেন যুগ যুগ ধরে। মিশর ও গ্রিসের মানুষ ছিলেন সুসভ্য, বুদ্ধিমান, যোদ্ধা, বিশেষত স্থাপত্য শিল্পে পারদর্শী। এই সময় রাজ্যে সুশিক্ষার জন্য পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা করে গড়ে উঠেছিল বহু গুরুকুল আশ্রম। পরে এখানেই গড়ে ওঠে মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়। সেটি বর্তমান দ্বারভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে যুক্ত হয়েছে।

জ্ঞানের পবিত্র প্রদীপের আলোতে আলোকিত হয়েছিল নারীদের অজ্ঞতার অন্ধকার। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই অসংখ্য নারীদের অতুলনীয় অবদান। তাই ভারতবর্ষ শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার জয়যাত্রা।

অযোধ্যায় তৎকালীন সাকেতের অশ্বঘোষ চোদ্দ বছর বয়সে মিথিলায় সংস্কৃত জ্ঞানার্জনের জন্য গুরুকুল আশ্রমে যোগদান করেন। আপন প্রতিভাবলে অত্যন্ত অল্পবয়সে ধর্ম, দর্শন সাহিত্য সংগীতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশ দেশান্তরে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে জনকপুরে একটি গুরুকুল আশ্রমে আচার্যপদে নিযুক্ত হন। পাশাপাশি আর একটি গুরুকুল আশ্রমের পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ভারতীয় নাম জ্ঞানাচার্য। তাঁরই একমাত্র অপূর্ব লাবণ্যময়ী কন্যা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করায় তার ভারতীয় নাম প্রভা। অলক্ষচারী ছাড়া আর কেউই জানতেন না এই অশ্বঘোষ ও প্রভা একদিন ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে নাট্য সম্রাট ও নাট্য সম্রাজ্ঞী হয়ে।

অশ্বঘোষ যেমন ছিলেন হাস্যজ্জ্বোল অপূর্ব সুন্দর সুপুরুষ, তেমনি গানের গলাটিও ছিল সুমধুর। বীণা ও বাঁশের বাঁশি বাজাতে ছিলেন ওস্তাদ। যখন বীণা ও বাঁশির সুরে গান গাইতেন তখন সকলেই মুগ্ধ হতেন। বসন্তের প্রভাতে কুয়াশায় ঢাকা গ্রামগুলি। অশ্বঘোষ মেঠোপথ ধরে সুমধুর বাঁশের বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছন্দে ছন্দে তালে তালে এগিয়ে চলেছেন রাজপুরীর দিকে। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন এক সাধক পুরুষ। প্রভাতে নদীতে স্নান সেরে বেদমন্ত্রগুলি সুললিত কণ্ঠে গাইতে গাইতে চলেছেন সেই পথ দিয়ে। অশ্বঘোষ প্রণাম করায় সাধক পুরুষ বললেন— ঈশ্বর লাভে ধন্য হোক তোমার জীবন। পরিচয় জিজ্ঞেস করায় বললেন— আমি অযোধ্যা সাকেতের সুবর্ণাক্ষির পুত্র অশ্বঘোষ। অশ্বঘোষ জিজ্ঞেস করায় সাধক পুরুষটি পরিচয় দিলেন— ভারতীয়রা এখানে আমাকে ঋষিরাজ বলেই ডাকেন। আমার আশ্রমের পালিত পুত্রস্বরূপ জ্ঞানাচার্য এখানে একটি গুরুকুল আশ্রমেরই পণ্ডিত। প্রত্যুত্তরে অশ্বঘোষ পরিচয় দিলেন— আমিও একটি গুরুকুল আশ্রমের আচার্য। ঋষিরাজ পুত্রস্নেহে বললেন— চলুন আমার গৃহাশ্রমে। কিন্তু আমরা জাতিতে গ্রিক। মহামুনি ভরত গ্রিসের নাট্যমঞ্চে আমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। তাই এখানে নিয়ে আসেন নাটক করতে। মহামান্য রাজা মুগ্ধ হয়ে বসবাসের জায়গা দেওয়ায় আশ্রমটি বহুকষ্টে গড়ে তুলেছি। অশ্বঘোষ আশ্রমে পৌঁছে দেখলেন অপূর্ব সুন্দর গৃহাশ্রমখানি।

সত্যই সাধক পুরুষেরই গৃহাশ্রম। হঠাৎ কানে ভেসে এল অপূর্ব বীণার ঝংকার। নৃত্যের তালে তালে সুমধুর সংগীতের সুর। অশ্বঘোষ জিজ্ঞেস করায় বললেন— শ্রীপঞ্চমী সমাগত। প্রতি বছর শ্রীপঞ্চমীতে এখানে আসেন রানিমা। তাই জ্ঞানাচার্যের মেয়ে প্রভা ছোটো ছোটো গ্রিক পল্লীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গীতিনাটক শেখাচ্ছে। চল, দেখে আসবে। এগিয়ে যেতে দেখলেন বহু প্রাচীন বকুল বৃক্ষের তলায় ছন্দে ছন্দে তালে তালে নৃত্য করে চলেছে প্রভা। সত্যই মনোমুগ্ধকর। কী অপূর্ব দশ্য। যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন অপ্সরা। মুগ্ধ হয়ে নাচগান দেখলেন অশ্বঘোষ। প্রভার দাদু অশ্বঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় প্রভা জিজ্ঞেস করলেন— কেমন দেখলেন আমার নাচগান? অশ্বঘোষ বললেন— সত্যই অপূর্ব। কিন্তু গানের (সংস্কৃত) উচ্চারণগুলি ঠিক হচ্ছে না। এই বলে প্রভার বীণাযন্ত্রটি হাতে নিয়ে অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে গান ধরলেন অশ্বঘোষ। সকলেই মুগ্ধ হলেন অশ্বঘোষের গান শুনে। অশ্বঘোষ ঋষিরাজকে বললেন— দাদু, আমি আপনার কাছে গ্রিক ভাষা শিক্ষালাভ করতে চাই। দাদু বললেন— নিশ্চয়ই শিখবে, কিন্তু তুমি প্রভাকে শেখাবে আমার লেখা গানগুলি। এইভাবে প্রভার সঙ্গে অশ্বঘোষের মিলন মঞ্চটি গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে অশ্বঘোষ আসতেন গ্রিক ভাষা শিক্ষালাভের জন্য। ঋষিরাজ ছিলেন সত্যম শিবম সুন্দরের উপাসক। গ্রিক নাটকগুলি ছিল কণ্ঠস্থ। অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে যখন গান শেখাতেন তখন প্রভা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়তে। অশ্বঘোষ তখন ধমক দিয়ে বলতেন— জানো? ভুল উচ্চারণ করলে কী হয়? ভরতমুনি গভীর চিন্তাভাবনায় গ্রিসের মেয়েদের নিয়ে লক্ষ্মী সরস্বতীর স্বয়ম্বর সভার গীতি নাটিকাটি অনুষ্ঠিত করছিলেন। নাট্যানুষ্ঠানে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন অপরূপা উর্বশী।

সরস্বতীর ভূমিকায় মেনকা। মেনকা অপূর্ব অভিনয় করে চলেছেন। উর্বশী পুরুষোত্তম কথাটির উচ্চারণ করলেন পুরুরবা। জ্ঞানীগুণী দর্শকমণ্ডলী প্রতিবাদ করে উঠলেন— এখানে পুরুরবা কথাটি কোথা থেকে এল? ভরতমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে ভুল উচ্চারণের জন্যে উর্বশীকে অভিশাপ দিলেন— স্বর্গরাজ্যে তোমার স্থান হবে না। আমার আদেশ তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করনি। তখন নাটানুষ্ঠানটি ভণ্ডুল হয়ে যায়। এখন যেমন কাশী, বারাণসী স্বর্গপুরী। প্রাচীনকালে মিশর ও গ্রিস ছিল পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য। উর্বশী গ্রিস থেকে বিতাড়িত হওয়ায় জীবনে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া নাট্যানুষ্ঠানে আসবেন বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ। ভুল উচ্চারণে কত বড়ো অমঙ্গল হতে পারে তা কি তুমি জানো? অশ্বঘোষের কথায় প্রভা গানে গভীর মনোনিবেশ করে। গানের শেষে রাম-সীতার জীবন কাহিনিটি যখন বর্ণনা করে শোনাতেন তখন প্রভার সঙ্গে বাড়ির সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এইভাবে প্রভার সঙ্গে অশ্বঘোষের গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। দেখতে দেখতে এসে গেল শ্রীপঞ্চমী।

গ্রিক পল্লীর ছেলে মেয়েরা জড়ো হয়েছে শ্রীপঞ্চমীর আরাধনায়। সন্ধ্যা সমাগত। এক অশ্বারোহী রাজপরিবার থেকে এসে খবর দিলেন— রানিমা এখানে আসছেন রথে। পল্লীর বধূরা সারি সারি ফুল চন্দন নিয়ে শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। পদব্রজে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছেন রানিমা। কী অপূর্ব। যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন মা দুর্গা। প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল চন্দনে বরণ করে নিলেন রানিমাকে। রাজর্ষি বললেন— রানিমার সঙ্গে এই গ্রিক পল্লীর গভীর ভালোবাসার কারণ রানিমার জন্ম এই গ্রিক পল্লীর ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাই ভারতীয় নাম শশীকলা। তাঁর অপূর্ব নাচে-গানে রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন দেবরাজ। বড়োরানিমা ছিলেন পুত্রহীনা। তাই পুত্র কামনায় দেবরাজ বিবাহ করেন শশীকলাকে। সরস্বতীর আরাধনার পর

লক্ষ্মী সরস্বতী স্বয়ম্বর সভায় গীতিনাটিকাটি দেখে মুগ্ধ হলেন রানিমা। গ্রিক পল্লীর প্রত্যেকটি শিশুকে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন। প্রভাকে উপহার দিলেন স্বর্ণালংকার। অনুষ্ঠানে অশ্বঘোষ রানিমাকে শোনালেন অপূর্ব সংগীত। রানিমা পুত্রস্নেহে অশ্বঘোষকে বললেন— রাজপুরীতে একটি নাটকের অনুষ্ঠান করতে। রাজর্ষি বললেন, আপনার অনুমতি পেলে দুর্গোৎসবের পরই রাজপুরীতে হবে নতুন নাটক। সেই থেকে অশ্বঘোষ মনোনিবেশ করলেন নাটক রচনায়। ভরতমুনি নাটক লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন— গ্রিসের নাটকগুলি ছিল খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের দৃশ্য। ইলিয়ড ও ওডিসি থেকে ঘটনাগুলি নেওয়া। ভারতীয় নাটকে থাকবে ভারতের ঘটনা, আন্তর্নিহিত থাকবে ভারতীয় দর্শন, মানব প্রেমের গূঢ় রহস্য ও বর্তমান সমাজ জীবনের প্রতিছবি। তাই অশ্বঘোষ অভিনয় উপযোগী সহজ সরল ভাষায় নাটক লিখলেন 'উর্বশী বিয়োগ ও সারিপুত্র'। নবরাগ নবরসে মিশ্রিত অষ্টাদশ দৃশ্যের নাটক।

নাট্যমঞ্চ সাজাবার সুকৌশল জানতেন গ্রিক পণ্ডিত। দুর্গামণ্ডপ যেমন সাজানো হয় তেমন মাঠের মাঝে বেত ও বাঁশের তৈরি উলুঘাসের ছাউনি, ফুল, লতা পাতায় সুসজ্জিত হলো বিশাল নাট্যমঞ্চ। এই মঞ্চে থাকত মহাদেবদেবীর মূর্তি। দেশের মানুষ নাটক দেখতে আসতেন এবং প্রত্যেকে যে যেমন পারতেন সাহায্য করতেন। প্রত্যেক দিন দেব-দেবীর আরাধনার পর তিন চারটি দৃশ্য অভিনয় হতো। বিশাল তাম্রপাত্র থাকত নাটশালায়। প্রত্যেকে যে যেমন পারত প্রণামি দিত। আর এক পার্শ্বে থাকত ফল-মূল আহারাদির গৃহ। দর্শকরা চিড়া, দই, আখের গুড়, কলা, আম, কাঁঠাল যে যা পারতেন দিতেন। নাটকের শেষে প্রত্যেক দর্শককে প্রসাদ দেওয়া হতো। এই নাটকের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠত প্রীতির সম্পর্ক। চলত মহোৎসব।

এই নাটক ছিল দেব-দেবীর আরাধনার অঙ্গ। রাজা রানিমা প্রজাদের আশীর্বাদ করতেন। রাজা ও রানিমাকে প্রণাম জানিয়ে দর্শকরা বাড়ি ফিরতেন। অশ্বঘোষের প্রথম লেখা নাটক শারিপুত্র প্রভার সঙ্গে অভিনীত হলো। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। অশ্বঘোষের কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটল। অশ্বঘোষের অভিনয়ের থেকে প্রভার অভিনয়ে মুগ্ধ হলেন সকলেই। মানুষের ভিড় জমতে থাকল। পরে নাটকটি গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করলেন রাজঋষি। এই রাজঋষির সুকৌশলে গ্রিসের নাট্যমঞ্চে এবং অভিনয়ে প্রভার ও অশ্বঘোষের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশ দেশান্তরে।

সন্ধ্যার সময় কেশবিন্যাসে ব্যস্ত প্রভা। অশ্বঘোষ আসবেন গান শেখাতে। মা একদিন নির্জনে আদরিণী মেয়েকে বললেন— প্রভা! এই নাটক নিয়ে থাকলে কি চলবে? তোমার এখন বিবাহের বয়স হয়েছে। কী সুন্দর ছেলে অশ্বঘোষ। তোমাকে মানাবেও সুন্দর। আমরা বললে ও কখনো অমত করবে না। প্রভা বলল— মা! তুমি কখনো ওকথা আর বলতে যেও না! তুমি অশ্বঘোষকে চিনতে পারনি। ও কখনো আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। ওরা ব্রাহ্মণ আমরা জাতিতে গ্রিস। তুমিও কি চাও সীতার মতো আমার জীবনটাও দুঃখে ভরে যাক? মা বললেন— সকল সময় তা কি কখনো হয়। এত মহৎ ছেলে জামাই হওয়া কী কম সৌভাগ্যের! অশ্বঘোষ এসে যাওয়ায় প্রভা চলে গেল মহাদেবের মন্দিরে গানের আসরে। সেদিন গানে অত্যন্ত অমনোযোগী প্রভা। বার বার অসন্তোষ প্রকাশ করছে অশ্বঘোষ। হঠাৎ দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল কালবৈশাখী ঝড়। প্রবল ঝড় বিদ্যুৎ বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। বাগানের ফল, ফুল, লতা-পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল রাস্তায়। দেখতে দেখতে নেমে এল সন্ধ্যা। এই বাড়ির অতিথি সেবাই ছিল পরম ধর্ম। গানের শেষে আহারাদির পর অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে রাম-সীতার কাহিনি শোনাতেন অশ্বঘোষ। বাড়ির সকলেই মুগ্ধ হয়ে তা শুনতেন। সকলেই বুঝে গেছেন সেদিন প্রভা ভীষণ অমনোযোগী হয়ে পড়ায় অশ্বঘোষ ভীষণ ক্রুদ্ধ। দাদু উপহাস করে প্রভাকে বলছেন— প্রভা তোমাকে আর গান শিখতে হবে না। শ্বশুরালয়ে গিয়ে থালা-বাসনই মাজবে। অশ্বঘোষ বলল— শুধু থালা বাসন মাজা নয়। সারাজীবন কাটাতে হবে দাসী হয়ে। প্রভা গম্ভীর হয়ে বলল— আমি জীবনে বিবাহ করব না। দাদু বললেন— প্রত্যেক নারীর ধর্ম বড়ো হলেই চলে যেতে হবে শ্বশুরালয়ে। অশ্বঘোষ বললেন— তাই করুন দাদু। আমিও চললাম। প্রভা বিষধর সর্পের মতো গর্জন করে উঠল। ক্রুদ্ধ মেজাজে বলল— আমি কি বুঝতে পারিনি আপনার মনের খবর? মরীচিকার ন্যায় আমার রূপযৌবনের আশায় ছুটে চলেছেন তা কখনো সার্থক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মা প্রভাকে বলল— একি! তুই কাকে কী বলছিস! বুদ্ধিসুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেয়েছে? প্রভা ছিল অত্যন্ত জেদি মেয়ে। ক্রুদ্ধ ভাষায় উত্তর দিল— আমি ঠিক বলছি মা। অত্যন্ত দুঃখে অশ্বঘোষ বেরিয়ে গেলেন গানের আসর থেকে।

রাজঋষি সিংহের ন্যায় গর্জন করে বললেন— অশ্বঘোষ দাঁড়াও। এই বড়িতে দাদুর উপর কথা বলার ক্ষমতা কারুর ছিল না। দাদু প্রভাকে ডেকে বললেন— প্রভা! তুমি অশ্বঘোষের নিকট যে অন্যায় করেছ ক্ষমা চেয়ে নাও। করুণ কণ্ঠে সজল নয়নে মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে প্রভা বলল— অন্যায় হয়েছে। অশ্বঘোষ গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন। দাদু প্রভাকে তীব্র ধিক্কার জানাল। অশ্বঘোষ তোমার গুরুস্থানীয়। আমি অভিশাপ দিচ্ছি— তোমার কখনও মঙ্গল হবে না। বাবা ও মা ধিক্কার জানাল প্রভাকে। প্রভা গভীর দুঃখে চলে গেল দেবমন্দিরে গানের গৃহে। পুত্রবধূ ঋষিরাজের পাদুটি জড়িয়ে ধরে বললেন— বাবা! আপনি সাধক পুরুষ! আপনার অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হবে না। আপনার এই ক্রোধ সাজে না। প্রভা অবুঝ মেয়ে আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন। দাদু বললেন— তীব্র দহনে লোহার মরিচা যেমন পরিষ্কার হয়, হাতুড়ির আঘাতে সুন্দর ইস্পাত থেকে তৈরি হয় ধারাল অস্ত্র। গভীর অনুতপ্ত না হলে মেয়েদের মনের ময়লা পরিষ্কার হয় না। যখন ও গভীর অনুতপ্ত হবে, অশ্বঘোষ হৃদয় থেকে ক্ষমা করবে। কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন আমার অভিশাপ থেকে ও মুক্তি পাবে।

আকাশেরও কান আছে। বাতাস খবর বয়ে নিয়ে যায় দেশ দেশান্তরে। রানিমা ডেকে পাঠালেন অশ্বঘোষকে। জিজ্ঞেস করলেন—

শুনলাম নাটক বন্ধ হয়ে যাবে? অশ্বঘোষ হতবাক। রানিমা বললেন— প্রভা গুরুতর অসুস্থ। শপথ করেছে জীবনে নাটক করবে না। আমার নির্দেশ তুমি বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয়ই নাটক করবে। রানিমার নির্দেশে বাধ্য হয়ে অশ্বঘোষ গেলেন অসুস্থ প্রভাকে দেখতে। অশ্বঘোষ এসে দেখলেন— সত্যই প্রভা গুরুতর অসুস্থ। দাদু বললেন— তুমি চলে যাওয়ার পর বীণাটি হাতে নিয়ে অঝোরে কাঁদছে। ত্যাগ করেছে আহার-নিদ্রা। অশ্বঘোষ এত উত্তেজিত লক্ষ্যই করেনি কখন খাবার দিয়েছে প্রভা। অশ্বঘোষ বললেন— হ্যাঁ আমার অপরাধ হয়েছে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। প্রভা হাত দুটি চেপে ধরে বললে— বলুন আমার একটি অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন? অশ্বঘোষ বললেন— তুমি যদি আমার কথা রক্ষা কর, তবেই আমি তোমার কথা রক্ষা করব। প্রভা বলল— আপনি আমাকে ছাড়া কখনো কাউকে বিয়ে করবেন না। অশ্বঘোষ হতবাক। কিছু সময় নীরব থেকে বললেন, তুমি যদি নিখুঁতভাবে নাটকটি অভিনয় করতে পার আমিও কথা দিচ্ছি— তোমাকে ছাড়া কাউকে বিবাহ করব না। দাদু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, বললেন— এগুলি নাট্যকারদের প্রেমের ছোঁয়াচে রোগ। এই প্রেমের ছোঁয়াচে রোগে সারা বিশ্বের নাট্যকাররা ভোগে। অশ্বঘোষ মাথায় গায়ে হাত বোলাতেই সমস্ত রোগ সেরে সুস্থ হয়ে উঠল প্রভা। অশ্বঘোষের সঙ্গে প্রভার রাজপুরীর রঙ্গমঞ্চে সারীপুত্র নাটকটি অভিনীত হলো। কী অপূর্ব অভিনয় প্রভার। হাজার হাজার জনতার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হলো মিথিলার নাট্যমঞ্চ। সারীপুত্র নাটকটিতে অপূর্ব অভিনয়ের জন্য রানিমা পুরস্কৃত করলেন প্রভাকে। অপূর্ব নাট্য রচনায় মহারাজ পুরস্কৃত করলেন অশ্বঘোষকে। এই ভাবে অশ্বঘোষ ও প্রভার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। অশ্বঘোষ প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা গুরুকুল আশ্রমে বিদ্যাভ্যাসের পূর্বে প্রণাম করতে যেতেন পার্শ্ববর্তী একটি প্রাচীন মহাদেবের মন্দিরে।

একদিন প্রভা সখীদের সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের মন্দিরে মালাবদল করায় প্রভার নামাঙ্কিত অঙ্গুরিটি পরিয়ে দিলেন অশ্বঘোষের হাতে। অশ্বঘোষ ও তাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরিটি পরিয়ে দিলেন প্রভার হাতে। একদিন এক দূত এসে পত্রটি দিলেন অশ্বঘোষের হাতে। চমকে উঠলেন অশ্বঘোষ। আমাকে যেতেই হবে। মা গুরুতর অসুস্থ। প্রভাকে বলল— বুদ্ধচরিত নাটকটি গুছিয়ে রাখ। প্রস্তুত হও পরবর্তী নাটকের জন্য। বহুদিন অতিবাহিত হলো অশ্বঘোষ ফিরে আসছেন না গুরুকুল আশ্রমে।

প্রভা বুঝতে পারলেন মহারাজ ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। গুরুকুল আশ্রমের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে। প্রভা রাজ পরিবারের রথ নিয়ে যাত্রা করল অযোধ্যা সাকেতে অশ্বঘোষের উদ্দেশে। যখন অযোধ্যা নগরীতে পৌঁছলেন— যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন অপরূপা পরি। তার দর্শনের জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড়। প্রভা দেখলেন মৃত্যুসজ্জায় শায়িত মায়ের পদতলে বসে আছেন অশ্বঘোষ। মা প্রভাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন— মা! কে তুমি? হঠাৎ দেখলেন— প্রভার হাতের অঙ্গুরীয়তে লেখা অশ্বঘোষের নাম। আর বুঝতে দেরি হলো না। এতো আমারই পুত্রবধূ। বহু কষ্টে উঠে বাক্স থেকে চন্দ্রহারটি প্রভার গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন— তোমরা সুখী হও। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বড়োছেলে ও বড়ো বৌমা। বৌমা ক্রুদ্ধ মেজাজে বললেন— জাননা ওরা জাতিতে গ্রিক। ওঁদের হাতের ছোঁয়া জল গ্রহণ করা মহাপাপ। বাবা ছেলেকে ডেকে বললেন— চতুর্দিকে শুনতে পাচ্ছ পণ্ডিত সমাজ কীভাবে ধিক্কার জানাচ্ছে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে উপবীত হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধভাষায় বললেন— আমি এই উপবীত হাতে নিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি, যদি গ্রিক মেয়েকে পুত্রবধূ করে গৃহে নিয়ে আস, আমরা গ্রাম থেকে তোমাকে সমাজচ্যুত করব। গ্রাম থেকে বহিষ্কার করব। তোমাদের বাড়িতে আমরা জল গ্রহণ করব না। গ্রামের অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছিল প্রভাকে দেখবার জন্যে। বৃদ্ধের কথায় সকলে ছিঃ ছিঃ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। বাবা অশ্বঘোষকে ডেকে বললেন— তোমাকে পাঠিয়েছিলাম জ্ঞানার্জনের জন্য, না প্রেম করার জন্যে? অশ্বঘোষ নিরুত্তর। প্রভা ধীর গতিতে উঠে এসে প্রশ্ন করলেন, বাবা আমি যদি আপনার মেয়ে হতাম, আপনি কী করতেন? বিস্মিত হয়ে বললেন— তুমি আমাকে বাবা বললে! প্রভা আবার বলল— হ্যাঁ বাবা! আমি তোমারই মেয়ে। সুবর্ণাক্ষীকে বুকে জড়িয়ে ধরে মহানন্দের অশ্রু ঝরে পড়ল। আমি বহুদিন ঈশ্বরের কাছে তোমার মতো একটি মেয়ের প্রার্থনা করেছিলাম। ঈশ্বরই আমার কাছে পাঠিয়েছেন তোমাকে। মায়ের অনুরোধে প্রভা বীণা যন্ত্রে গান ধরলেন। আড়াল থেকে সকলেই এই ঘটনা লক্ষ করছিলেন। ধীরে ধীরে সকলেই প্রভার গানে মুগ্ধ হয়ে অশ্বঘোষের বাড়িতে এল। যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধিক্কার জনিয়েছিলেন, তিনি বললেন— আমি আশীর্বাদ করি একদিন তুমি হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়িকা। ভিতর থেক ক্ষীণ কণ্ঠে অশ্বঘোষের মা ডাকলেন।

বললেন, এই বিশ্ব প্রকৃতির নাট্যশালার দিকে তাকিয়ে দেখ— শতকোটি মানুষ রঙ্গমঞ্চে কীভাবে নাটক করছে। নাট্য শেষে তারা কোথায় যাচ্ছে। একটু পরেই আমার আত্মা যখন বেরিয়ে যাবে। জ্বলন্ত চিতায় দেহটাকে তুলে দেবে। মা! তুমি কী চাও? তোমার জন্ম হয়েছে কোটি কোটি মানুষের অন্তরের আলো জ্বেলে দেওয়ার জন্য। কোটি কোটি সন্তানের চলার পথ দেখাবে তুমি। তুমি যে ভারতের নাট্য সাম্রাজ্ঞী। এই বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অশ্বঘোষের জননী। সেদিন থেকে জ্ঞানচক্ষু ফিরে পেল প্রভা। সংসার জীবনে প্রবেশ করতে আর মন চাইল না। সেদিন থেকে প্রভার জীবনে ঘটল অদ্ভুত পরিবর্তন। অশ্বঘোষকে বলল— তুমি আমাকে বিবাহ না করলেও সারাজীবন তোমার চরণ যুগল পুজো করে যাব হৃদয় মন্দিরে। এই বলে প্রভা চলে গেলেন নিজ বাসভূমিতে। গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করল প্রভা। অশ্বঘোষ বাবাকে বললেন— মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ। এই বলে বিহারের রাজগিরে এক মন্দিরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৌদ্ধমঠে যোগদান করলেন। পরে অযোধ্যায় বৌদ্ধ বিহারে ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তারপর বৌদ্ধ বিহারেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অশ্বঘোষ। ■

মোশান মাস্টার মন্মথমোহন

কণিকা দত্ত

এ বেদনা বড়ো মর্মান্তিক। ছটফট করছেন মন্মথমোহন। থমকে গেছে দেশ জুড়ে পুজো-পার্বণ নিয়ে 'মহাভারত' লেখার কাজ। ৯১ বছর বয়স। এখনও চোখে চশমা তুলতে হয়নি। কর্মোদ্দীপনায় এই বয়সে যে কোনও যুবাকেও হার মানাতে পারেন তিনি। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে লেখার চেষ্টা করছেন মন্মথমোহন। থেমে যাচ্ছে কলম। মাথা ঝুঁকে পড়ছে লেখার খাতার উপর। জলে ভরে উঠছে দু'চোখ। অনেকটা জীবন তো বাঁচা গেল। যদিও কাজ এখনও অনেক বাকি। তবুও চলে যাবার কথা তো তাঁর।

সেই অন্তর্দহনের উত্তাপ উগরে দিলেন স্কটিশ চার্চের স্মরণসভাতেও। বিধ্বস্ত মন শরীরও। তাই লিখে নিয়ে এসেছেন কষ্টের কথাগুলি। 'পিতার শ্রাদ্ধ পুত্রে করিয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি দৈবক্রমে পিতাকে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহা কিরূপ কষ্টকর সকলেই বুঝিতে পারেন। শিশিরকুমার ছিল আমার পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ শিষ্য।'

কান্নায় গলা বুজে আসছে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর। নাট্যাচার্যকে তো তিনিই গড়েপিটে মঞ্চ সম্রাট করে তুলেছিলেন। জীবনে যাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন, যাঁর মাধ্যমে তিনি রঙ্গালয়ে আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার সাধনে সফলকাম হয়েছিলেন। সেই প্রিয়তম শিষ্য ও ছাত্র শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অকাল প্রয়াণে কার্যত ভেঙে পড়লেন অধ্যাপক বসু।

১৯৫০ সালের ১০ অক্টোবর, আচার্য বসুর ৮১তম জন্মদিবস উপলক্ষে স্কটিশের প্রাক্তন ছাত্ররা একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ছিলেন স্কটিশের প্রাক্তনী তৎকালীন রঙ্গালয়ের 'সেলিব্রিটি' শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সেদিন আচার্যকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শিশিরকুমার বলেছিলেন, 'আমার জীবনের এক স্মরণীয় ক্ষণে নটের বৃত্তি গ্রহণ করবার সময়ে আমি আচার্য মন্মথমোহনের কাছ থেকেই উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম। তিনিই আমার গতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলে বাংলাদেশের পেশাদার মঞ্চে দেখা দিল নতুন জীবন।"

Ring out the old, ring in the new-এর জীবন্ত প্রতীক মন্মথমোহন বসু ছিলেন দশঘড়ার এক সুপ্রাচীন কায়স্থ বংশের সন্তান। মালাধর বসুর বংশধর মন্মথমোহন বসুর জন্ম ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে।

শিক্ষক, সমালোচক, সাহিত্যরসিক, নাট্যকার এবং সর্বোপরি নাট্যশিক্ষক মন্মথমোহন বসুর গোটা জীবনটাই বলতে গেলে বাংলা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত ছিল। তাঁর কাজের কেন্দ্র ছিল স্কটিশ চার্চ স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

শিক্ষাব্রতী মানুষটির কর্মজীবনের শুরু স্কটিশ চার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে। স্কুলের শিক্ষক হলেও কলেজে নিয়মিত তিনি বাংলা ক্লাস নিতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এবং ১৯৩৪ সালে স্কটিশ কলেজের অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তিনি এই কলেজেই এমিরিটাস অধ্যাপক পদে আসীন হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশ লেকচারার হিসাবে 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' নিয়ে যে সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছিলেন। তা আজও নাট্য গবেষকদের কাছে মূল্যবান দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বাংলা নাট্য সাহিত্য নিয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক পান।

১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতি রূপে প্রতিষ্ঠানটির তিনটি পদই অলংকৃত করেন মন্মথমোহন। সেই সময়কালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নয়নে অধ্যাপক বসুর অবদান অবিস্মরণীয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এই দুই যুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছিল তাঁর জীবনচর্যা। বিংশ শতকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন মানুষটি।

Wit-এর ঝলকই তাঁর সাহিত্যে ধরা পড়ত সবচেয়ে বেশি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল ঐতিহাসিক। একটানা কুড়ি বছর তিনি শিয়ালদা কোর্টে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আসীন ছিলেন। মন্মথমোহনই প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট যিনি তাঁর কার্যকালে বাংলা ভাষায় আদালতের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

কর্মদ্যোগী মানুষটি নব্বই বছর বয়সেও নতুন কিছু করার তাড়নায় টগবগ করে ফুটতেন। নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার জন্য মন্মথমোহনের উদ্যম ও উৎসাহ ছিল ঐতিহাসিক। সেই সময়ের প্রায় সবকটি নামকরা অপেশাদার ক্লাবের নাট্যশিক্ষক ছিলেন তিনি। সেই সূত্রেই তাঁকে সবাই 'মোশান মাস্টার' বলে ডাকত। অ্যামেচার ক্লাব থেকে পেশাদার থিয়েটার সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

বাংলার মতো ইংরেজিতেও ছিলেন সমান দক্ষ। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো। বাংলা আচকান পরিহিত, বিরল কেশ, সদাহস্যময় মানুষটি ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপক, দপুটে নাট্যশিক্ষক, ছাত্রবৎসল, অমায়িক ও সহজ-সরল।

এহেন শ্রদ্ধাস্পদ মানুষটির প্রয়াণ বিংশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তথা নাট্যশালার ইতিহাসে একটি শোকাবহ ঘটনা সন্দেহ নেই। তার থেকেও মর্মান্তিক বাঙ্গালির স্মৃতি থেকে 'মোশান মাস্টার মন্মথমোহন'-এর নাম প্রায় মুছে যেতে বসা। ■

ধূপ-নৈবেদ্যর আড়ালে আজও যিনি ভাস্বর

স্বামী অতীশানন্দ

শৈশবে মুষ্ঠি ভিক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহ করে রোগীদের শুশ্রূষা, আত্মীয় স্বজনহীন মৃত ব্যক্তির সৎকার এবং দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল শ্রীপ্রণবানন্দজীর কর্মজীবন। কাজেই ব্যক্তি জীবনে তিনি এমন নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে চলতেন। পরবর্তীকালে সন্ন্যাসীদের উদ্দ্যেশ্যে বলেছিলেন— ''দিনটা যদি আরও খানিকটা লম্বা হতো তবে আরও খানিক কাজ করার সুবিধা হতো, ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে যেখানে কাজ হয় না, সে জীবন কি একটা জীবন?''

ইং ১৯১৭ সাল। তখনও দেশভাগ ভাগ হয়নি। ভারতজননী ব্রিটিশের হাতে পরাধীন। গান্ধীজী, দেশবন্ধু ও নেতাজী সবাই এক যোগে কাজ করছেন। লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা। প্রণবানন্দজী তখন ১৮ বছরের যুবক। বাল্য নাম বিনোদ। স্বদেশি আন্দোলনে বিপ্লবীদের পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দানের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাকে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি মাসের জন্য করারুদ্ধ করেন। এই সময় ধ্যান করতে করতে হঠাৎ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সহসা স্বগতোক্তি— 'এই সামান্য লোহার রড, এ তো যে কোনো সময় দু'হাতে উপড়ে ফেলতে পারি।' তার গুরুদেব ধ্যানে জানতে পেরে দিব্যদর্শন দিয়ে শিষ্যকে আশ্বস্ত করলেন। যিনি ভবিষ্যৎ ধর্মচক্র ও কর্মচক্রের উদগাতা, কোটি কোটি মানুষের অন্নবস্ত্র ও মুক্তি প্রদানকারী, তিনি কিনা এই সামান্য কারাগারে আবদ্ধ থাকবেন? অবশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ব্রিটিশরাজ তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেন।

প্রকৃত অর্থে, এই মুক্তি তিনি নিজের জন্য চাননি, চেয়েছিলেন দেশের মুক্তি। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত প্রদক্ষিণ করে উপলব্ধি করলেন, ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে। চাই শিক্ষা, কর্মসংস্থান। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যত শক্তিশালী হবে, ততই উন্নত হবে ভারতবর্ষ।

কিন্তু প্রণবানন্দজী অধ্যাত্মসাধনায় ডুবে থাকলেও জাগতিক বিষয়ে ছিলেন সচল বিশ্বনাথ। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সবার আগে। এজন্য সেবাকাজে সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। সামান্য কয়েকজন মানুষের দীক্ষা বা মুক্তির জন্য তিনি আসেননি, তিনি এসেছিলেন পাপীতাপীদের উদ্ধার এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। ভারতবাসীকে একই মহামিলনের সূত্রে আবদ্ধ করে এক অখণ্ড শক্তিশালী ভারতবর্ষ গড়তে চেয়েছিলেন।

অন্যায় দেখলে তার ছিল সোচ্চার প্রতিবাদ। একবার ছাত্র বিনোদ মায়ের আদেশে গয়াধামে পিতৃদেবের পিণ্ডদানের জন্য স্টেশনে নামতেই পাণ্ডারা তাকে ধরে টানাটানি শুরু করল। অমনি রুদ্রমূর্তি ধরে এমন ভাবে রুখে দাঁড়ালেন পাণ্ডারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ওইখানে দাঁড়িয়ে সংকল্প করলেন, আমার প্রথম সেবাকাজের সূচনা ও আশ্রম স্থাপন হবে এই গয়াতে। আজও কোটি কোটি মানুষ গয়ায় পিণ্ডদানে এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে নিরাপদে তীর্থ কাজ ও আহারাদির সুযোগ পেয়ে থাকেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি স্বামী প্রণবানন্দজীর জন্মদিন বা শুভ আবির্ভাব দিবস। তাঁর এই দিনটি শুধু আশ্রমে কেন সর্বত্রই যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। লোক দেখানো সেবা আর সস্তা রাজনীতি পছন্দ করতেন না বলে আজও তিনি প্রচারের আড়ালে। তিনি কথা কম বলে কাজ বেশি করতেন এটাই তার স্বাতন্ত্র্য। তাঁর গাম্ভীর্য এমন ছিল তার সামনে কেউ কথা বলতে ভয় পেতেন। অবশ্য কারও কারও মনের জিজ্ঞাসা আকার ইঙ্গিতেই তারা পেয়ে যেতেন।

বলাবাহুল্য, তিনি তরুণ ও যুব সমাজকে বেশি ভালোবাসতেন। কারণ সমাজের আবহাওয়া এই তরুণরাই বদলাতে পারে। এজন্য প্রণবানন্দজী শৈশবে ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে সেবাদল গড়েছিলেন। আর যাদের নিয়ে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘ গঠন করবেন তারা সাধারণ গৃহীঘরের সুসন্তান। ছোটোবেলা থেকে প্রিয় বিনোদ ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে এসে তারাও ত্যাগী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

আসলে একশ্রেণীর অজ্ঞ ভক্ত শ্রীপ্রণবানন্দজীর বীর্যবত্তার কথা ভুলে শুধু ধূপধুনো আর পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁকে পুজোর আসনে বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ পূজা তিনি চাননি, তিনি অন্ধ-আতুর-দুঃস্থ এদের সেবাই আসল পূজা বলে মনে করতেন। 'জীবন সংগ্রামে দুর্বলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কাপুরুষ নিশ্চেষ্ট যে আমার আশীর্বাদ সে লাভ করতে পারে না'---এ স্বয়ং তাঁরই উক্তি। তাই স্বামী প্রণবানন্দজীর মহান ঐশ্বর্য ও বীর্যবত্তার কথা স্মরণ করে তার কর্মময় জীবনাদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরে সঠিক প্রচারের আলোয় আসার সুযোগ করে দিতে হবে, নইলে আসল সত্যটুকু বেলপাতার নীচে চাপা থাকবে। এই সহজ কথাটি সকলেই জানতে পারলে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা সার্থক হবে, নচেৎ সারাজীবন তিনি চিরনমস্য হয়েও ব্রাত্যই থেকে যাবেন।

(লেখক শিলিগুড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী)

পুস্তক প্রসঙ্গ

মহাপ্রাণের অভিধান

কোহানা রায়

প্রাণী সম্পদ একটি দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। 'মহাপ্রাণের ভুবনে' গ্রন্থের লেখক তাপস অধিকারী গ্রন্থটির মুখবন্ধে একথা বলেছেন। লেখকের এই কথাটি যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য এই প্রাণী জগৎ এবং জীববৈচিত্র্যই প্রকৃতিকে রক্ষা করে এবং ধারণ করে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায় এই সুন্দর পৃথিবীকে। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, এই প্রকৃতিকে আমরাই নানাভাবে ধ্বংস করে চলেছি। বৃক্ষচ্ছেদন থেকে শুরু করে চোরাশিকারের মতো ঘৃণ্য অপরাধ করে পরিবেশ এবং মূল্যবান প্রাণকে হত্যা করছি। আর এসব করেই পৃথিবীর সামনে এক ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনছি। ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বেই পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা নজরে পড়ছে আমাদের। তাপসবাবুর 'মহাপ্রাণের ভুবনে' গ্রন্থটির গুরুত্ব এই কারণেই যে প্রাণীজগৎ সম্পর্কে লেখক আমাদের নতুনভাবে আলোকিত করতে পেরেছেন। তাদের সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন।, সর্বোপরি পরিবেশ রক্ষায় এই প্রাণী জগতের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করাতে পেরেছেন। গ্রন্থটি একটি সময়োপযোগী গ্রন্থ হিসেবেও বিবেচিত হবে।

'মহাপ্রাণের ভুবনে' গ্রন্থটি পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পিঁপড়ে থেকে শুরু করে পাখি, ঊর্ণনাভ থেকে হাতি, পেঙ্গুইন থেকে বন্যকুকুর— প্রাণী জগৎকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এই পুস্তকে। এই প্রাণীজগৎ আমাদের পৃথিবীকে কীভাবে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করছে তার উদহরণও লেখক দিয়েছেন। গ্রন্থের 'পিঁপড়ে পুরাণ' অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন— 'পিঁপড়েরা পরিবেশকে পাল্টে দিতে পারে। পিঁপড়ের কিছু প্রজাতি রয়েছে, যারা নিজেদের শরীর থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করাতে উত্তম

ভূমিকা পালন করে যাবে। যাকে লাইমস্টোনও বলা হয়। এই পদ্ধতি বাতাস থেকে ক্ষতিকারক কার্বন- ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়।' আবার অনেক অজানা এবং কমজানা তথ্যও আমাদের সামনে হাজির করেছেন লেখক। আমরা কজন জানি— এদেশে আট প্রজাতির হনুমানের সন্ধান মেলে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মেলে দুই প্রজাতির হনুমানের হদিশ। তাপসবাবু তাঁর গ্রন্থে সেই তথ্যও উপস্থাপিত করেছেন। তাপসবাবুই জানিয়েছেন, মানুষ মাত্র দুশো বছর আগে রাডার আবিষ্কার করলেও, বাদুড় রাডার আবিষ্কার করেছে ছ' কোটি বছর আগে। বাদুড় এক অদ্ভুত নিজস্ব দক্ষতায় 'সুপারসনিক' শব্দ তৈরি করে— জানিয়েছেন সে তথ্যও। বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিড়াল 'থেরাপি ক্যাট'-এর কথাও জানতে পারছি তাপসবাবুর গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ই ঋদ্ধ করছে, প্রাণী জগৎকে নতুনভাবে চিনতে ও ভালোবাসতে সাহায্য করছে। এই গ্রন্থেই যখন পড়ি, বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে পেঙ্গুইনরা বিপন্ন হতে বসেছে— তখন আশঙ্কিত হতে হয় বই কি!

বইয়ের ছাপা এবং বাঁধাই খুবই ভালো। প্রচ্ছদও সুদৃশ্য। তবু বইয়ের ভিতরে যদি ছবির সংখ্যা আর একটু বেশি হতো এবং ভিতরের ছবিগুলি যদি রঙিন হতো— তবে বইটি আরও দৃষ্টিনন্দন হতো। তবু বলব, গ্রন্থটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সকল বয়সের সব ধরনের শ্রোতার অবশ্য পাঠ্য। পরিবেশ এবং প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে যদি আমাদের সামান্যতমও সচেতন করতে পারে— তবে সেটিই হবে এই গ্রন্থের সার্থকতা।

মহাপ্রাণের ভুবনে।।
লেখক : তাপস অধিকরী।।
প্রকাশক : তথাগত।
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড।
কলকাতা-৭০০০৯।।
দাম : ৪০০ টাক।

আমার কোকো

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আজকাল আর গুড়িয়া খেলতে যায় না। কারণটা তার বন্ধুরাও ঠিক জানে না। কারণ তো তাদের বলেইনি যে, তাদের বাড়িতে একটা নতুন বন্ধু এসেছে। গুড়িয়া তার নাম রেখেছে কোকো। আসলে গুড়িয়ার বাবা তার জন্য ছোট্টো একটা বদ্রিপাখি নিয়ে এনেছে। আর গুড়িয়া তো খুব ভালোবাসে চকোলেট খেতে। তাই সেই নতুন পাখিটার নাম দিয়েছে কোকো।

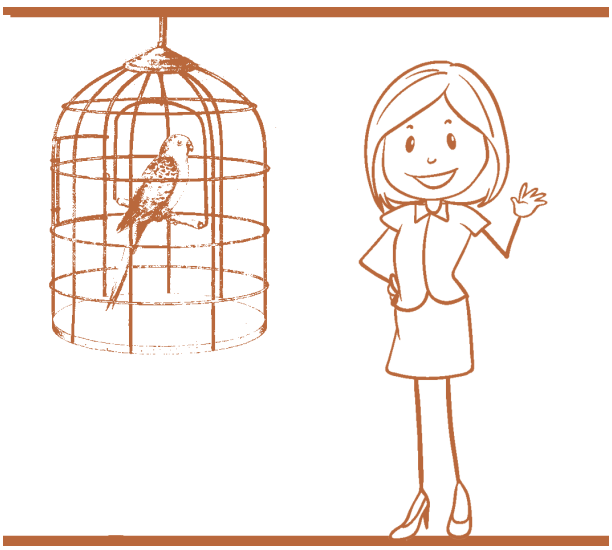

নাম ধরে ডাকলেই কোকো ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায়। খুব অবাক লাগে গুড়িয়ার, কোকো কীভাবে জানল এটা তার নাম! কোকো খুব সুন্দর। গুড়িয়া স্কুল থেকে ফিরে কোকোর সঙ্গে খেলা করে। ওই যে খাঁচার ভিতর তিড়িং বিড়িং করে লাফায়, সেটা খুব ভালো লাগে গুড়িয়ার। নানা ভাবে আওয়াজ করে, নানা ভাবে ঘাড় নাড়িয়ে নাড়িয়ে লাফায়। সেই দেখতে দেখতে গুড়িয়ার সময় কেটে যায়। তাই আজকাল আর খেলতে যেতে মন চায় না।

গুড়িয়া ভাবে, তার স্কুলের বন্ধুদের একদিন ডাকবে তার নতুন বন্ধু কোকোকে দেখাতে। সেদিন সবাই চমকে যাবে। টিয়া, বাপ্পা, মুনাই, পম্পি সব্বাইকে ডাকবে গুড়িয়া। সেদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে গুড়িয়া বাবার কাছে গেল। বাবা তখন খাচ্ছিলেন।

—বাবা, আমার খুব ইচ্ছে কোকোকে আমার সব বন্ধুকে দেখাব, বলল গুড়িয়া।

—বেশ তো একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। কোকোও আনন্দ পাবে, বলল বাবা।

—কোকো আনন্দ পাবে? কোকো এসব বুঝতে পারে? অবাক হয়ে জানতে চাইল গুড়িয়া।

—হ্যাঁ, কেন বুঝবে না, ও তো একটা প্রাণী। ওর তো মন আছে। ও সব বোঝে। ও শুধু আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাই ওর মনের কথা আমাদের বুঝাতে পারে না, বললেন বাবা।

গুড়িয়া সেদিন সব শুনে কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেল নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে গুড়িয়া ভাবতে লাগল, সত্যি তো এটা আমি একবারও ভাবিনি যে কোকোও সব বুঝতে পারে। ওর লাফানো ঝাপানোর মধ্যে দিয়ে ও নিশ্চয়ই কিছু বলতে চায় সবাইকে। কে জানে!

—কী রে এখনো ঘুমোসনি? কাল তো স্কুল আছে, গায়ের চাদরটা টেনে দিতে দিতে গুড়িয়ার মা বলে।

—আচ্ছা মা,কোকোর বাবা-মা-ভাই-বোন, বন্ধু সবাই আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। তোমার যেমন আছে, ওরও তেমনি আছে, মা উত্তর দিল।

—তাহলে কোকো সবাইতে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে থাকছে কেন?, জিজ্ঞাসা করল গুড়িয়া।

—হ্যাঁ তাই তো।

—তাহলে মা, ওর তো মন খারাপ করে সবার জন্য।

—করে তো। কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন আমাদের কাছে থাকুক না, ধীরে ধীরে সবার কথা ভুলে যাবে, বলল গুড়িয়ার মা।

কথাটা ঠিক মনের মতো লাগলো না গুড়িয়ার। এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল গুড়িয়া। সকালবেলা মা কেন যে সুটকেস গোছাচ্ছে গুড়িয়া বুঝতেই পারল না। কাজের মাসি বলল মা কয়েকদিনের জন্য মামার বাড়ি যাচ্ছে। মামা খুব অসুস্থ। তোমার তো সামনে পরীক্ষা, তাই মা একাই যাবে। সব শুনে গুড়িয়ার মন খারাপ হয়ে গেল।

—মা তোমাকে ছাড়া আমি যে একা থাকতে পারি না, কিছুতেই পানি না, কাঁদতে কাঁদতে বলল গুড়িয়া।

হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল গুড়িয়ার। বুঝতে পারলো সে স্বপ্ন দেখছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সে ঘরের বাইরে এসে দেখল কোকো খাঁচার ভিতর থেকে দূরের আকাশের দিকে এক মনে তাকিয়ে আছে।

---কোকো কোকো, অ্যাই কোকো, ধীরে ধীরে ডাকল গুড়িয়া। কোকো ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। অস্ফুট কিছু শব্দ করল। গুড়িয়া ভাবল কোকো হয়তো তাকে সুপ্রভাত বলল। মনে মনে হাসল গুড়িয়া। তারপর খাঁচার দরজাটা খুলে দিল

---কোকো মায়ের কাছে ফিরে যা। সেখানেই তুই সবচেয়ে ভালো থাকবি। আমি জানি, বলল গুড়িয়া।

কোকো পাখা মেলে উড়ে গেল। অনেক অনেক দূরের পথে পাড়ি দিল সে। সব শুনে বাবা তো অবাক।

—কিন্তু কোকোকে ছাড়া তোমার মনটা তো খারাপ হবে, বলল বাবা।

—তা হবে, কিন্তু কোকোরও তো মায়ের জন্য মন কেমন করছে। আমি ওকে দেখেই বুঝেছি ওর মন ভালো নেই, কাঁদতে কাঁদতে বলল গুড়িয়া।

বাবা মা সবাই বুঝল তাদের ছোট্টো গুড়িয়া অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

আকাশ দেববর্মণ

ভারতের পথে পথে

গণপতিপুলে

আরব সাগরের দক্ষিণ কোঙ্কন উপকূলে সবুজে ঘেরা মন্দির পাহাড় গণপতিপুলে। ১০০ মিটার উঁচু মন্দির পাহাড়টাই সিদ্ধিদাতা গণেশ আকৃতির। লোকশ্রুতি, বহু বছর আগে সিদ্ধিদাতা গণপতি এখানে আসেন তাঁর বাহন ইঁদুরকে নিয়ে। নীচে থেকে উপরে ওঠার পথ উঠেছে পাহাড়কে ঘুরে ঘুরে অর্থাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করে। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে অর্থাৎ গণেশ চতুর্থীতে যাত্রী আসেন দূরদূরান্ত থেকে। শিবাজী মহারাজের আমলে প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে পেশোয়াদের হাতে মন্দিরের সংস্কার হয়। এখানকার বহু বছরের প্রাচীন গণপতি মন্দিরটিই শুধু নয়, ছায়া সুনিবিড় নারকেল ও ঝাউগাছে ঘেরা শান্ত রুপালি বেলাভূমিটিও পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। গণপতিপুলে মারাঠা সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানও বটে। এর আশেপাশেই রয়েছে মরাঠা কবি কেশবসূত স্মারক, জয়গড় দুর্গ, মরালেশ্বর শিবমন্দির ইত্যাদি।

জানো কি?

- ভারতে প্রথম ইন্টারনেট উপলব্ধ ম্যাগাজিন ইন্ডিয়া টুডে।
- ভারতে প্রথম কমপিউটার চালিত ডাকঘর নয়া দিল্লি।
- ভারতে তৈরি কমপিউটার হলো সিদ্ধার্থ।
- ভারতে প্রথম কমপিউটার প্রস্তুতকারী সংস্থা উইপ্রো।
- ভারতীয় ডাক বিভাগ ই-পোস্ট চালু করে ২০০৪ সালে।
- ইন্টারনেটকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বলা হয়।
- আইকন হলো ছবির কমান্ড।

ভালো কথা

দাদুর কাক-শালিক

দাদু প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা মর্নিংওয়াক করেন। আমাকে বলেন সকালে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে দিবি। সকালের হাওয়া লাখ টাকার দাওয়া। তারপর বাড়ি ফিরে চা খেয়ে চার-পাঁচটা বিস্কুট হাতে নিয়ে বারন্দায় দাঁড়ান। দাদুকে দেখেই দু'তিনটে কাক উড়ে এসে সামনের দেওয়ালে বসে। বিস্কুট ভেঙে ওদের মুখে দাদু ধরিয়ে দিলেই ওরা উড়ে চলে যায়। তারপর তিনটে শালিক আসে। ওদেরও মুখে দাদু বিস্কুট ধরিয়ে দেন। একদিন দাদু কলকাতায় গেছেন। সকালে দাদুকে না পেয়ে কাকগুলো কা কা আর শালিক তিনটে কিচির মিচির করছে। আমি ঘর থেকে চারটে বিস্কুট এনে ভেঙে ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা পালিয়ে গেল। ফিরে দেখি ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, দাদুর মতো তোর মনটা আগে নিষ্পাপ কর, তবে তো তোর হাত থেকে ওরা বিস্কুট খাবে। পাখিরাও মানুষের মন বোঝে। সবার কাছে ওরা যায় না।

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, একাদশ শ্রেণী, পুলিশ লাইন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বন্ধুর প্রতি

রূপষা দেবনাথ, নবম শ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯

বন্ধু আমি বন্ধু তুমি
বন্ধুর মতো থেকো
অন্য কোনো বন্ধু পেলেও
আমায় ভুলো নাকো।
চিরকালটা আমরা যেন
বন্ধু হয়েই চলি
মনে মনে ভগবানকে
এই কথাটিই বলি।

মনে আছে যেদিন মোদের
প্রথম দেখা হয়
আমিও নতুন তুমিও নতুন
মনে ছিল ভয়।
তারপরেতে বন্ধু হয়ে
রয়েছি এতদিন
সার্থক মোরা বন্ধুত্ব মোদের
রয়েছে অমলিন।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ৯।।

মহলের ভিতর শত শত সাধু-সন্ত পূজা-পাঠ করলেন।

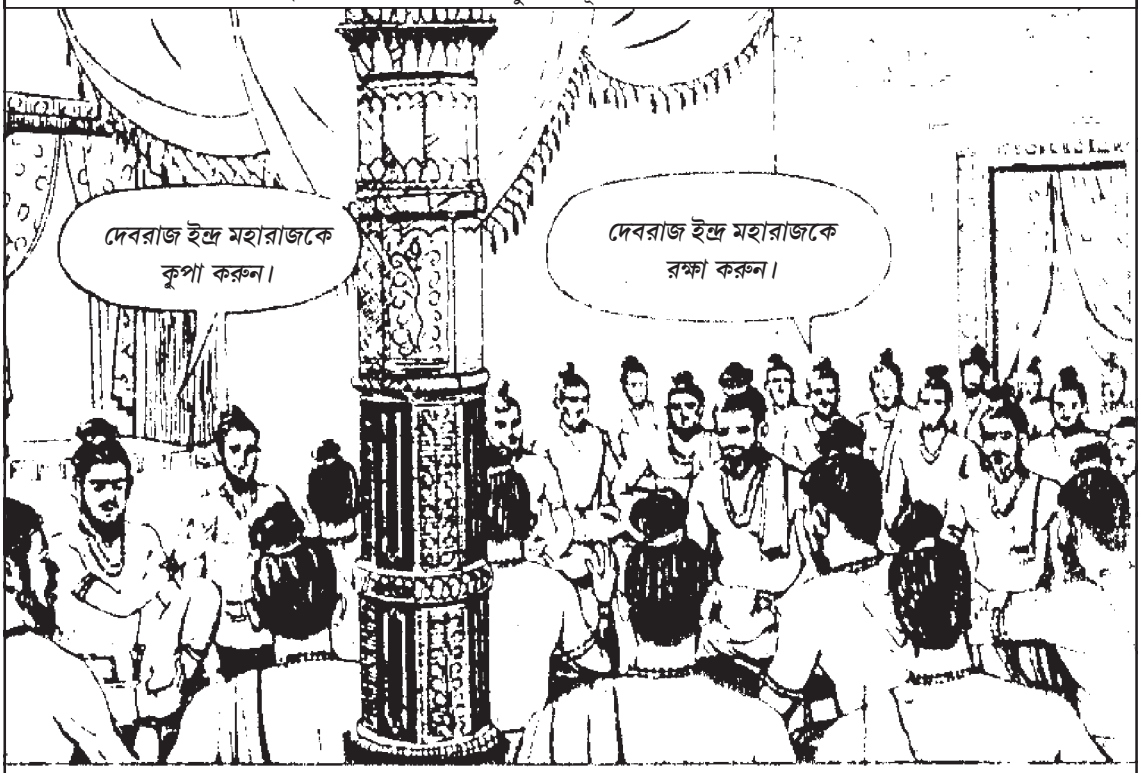

রাজবৈদ্য প্রতিদিন মহারাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

কোথায় থামবেন জকোভিচ কার্লসেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নোভাক জকোভিচের প্রিয় মৃগয়াক্ষেত্র মেলবোর্নের সিন্থেটিক কোর্ট। এবার নিয়ে সাতবার রেকর্ডসংখ্যক অস্ট্রেলিয়ন ওপেন জিতে ১৫টি গ্র্যান্ডস্লাম খেতাবের অধিকারী জকোভিচ তাড়া করছেন সমসাময়িক অপর দুই মহান কিংবদন্তী রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদালকে। রজার ও রাফাল যথাক্রমে ২০ ও ১৭টি করে গ্র্যান্ডস্লাম জিতেছেন। অ্যান্ডিমারে অবসর নিতে চলেছেন। তাঁর ঝুলিতে আছে ৫টি গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব। এই 'ফ্যাব ফোর' অসাধারণ দক্ষতায় বিশ্ব টেনিসকে যেভাবে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর তুলনা মেলা ভার। গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট খেলা হচ্ছে সেই একশো বছরের অধিক সময় ধরে। কখনও সমমানের সর্বোচ্চ দক্ষতা ও গৌরবসম্পন্ন খেলোয়াড় খুব বেশি একটা দেখা যায়নি। ৫০-৬০-এর দশকে ডোনাল্ড বাজ, রড লেভার, পনচো সেগুইরা, রয় এমার্সন, জন নিউকোম্ব, কেন রোজেওয়ালদের মধ্যে এরকম তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেছিল। ডনবাজ ও রড লেভার একই বছরে চারটি গ্র্যান্ডস্লম জিতে যে দুর্লভ নজির তৈরি করেছিলেন সেটা অবশ্য ছুঁতে পারে না এই 'ফ্যাব ফোরের' কেউ। তবে গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব জয়ের নিরিখে এরা লেভার, বাজকে টপকে গিয়েছেন। নোভাক জকোভিচ ও তাঁর কোচিং সাপোর্ট স্টাফরা মিলে তিন বছর আগে অনেক গবেষণা করে যে সুষমখাদ্য অভ্যাস প্রণালী আবিষ্কার করেছেন তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যা 'হু'। শুধু অ্যাথলিট ক্রীড়াবিদরাই নন সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনচর্চা করতে হলে এই খাদ্যাভাসের মধ্যে থাকতে হবে, এমনটাই মত 'হু'র। তাই জকোভিচ এই সিস্টেমের দ্বারা চালিত হয়ে আর সব টেনিস তারকার থেকে মানসিক দিকে একটু বেশিই তরতাজা থাকেন দীর্ঘদিন, কঠিন ম্যাচের মধ্যেও। সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও দেখা গেল তার প্রমাণ। যে নাদাল তার রোমান ভাস্কর্যে খোদাই করা চেহারা এবং চূড়ান্ত ফিটনেসের দৌলতে সবার কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ান কোর্টের মধ্যে, সেই নাদালকে পর্যন্ত স্ট্রেট সেটে বলতে গেলে দাঁড় করিয়ে হারিয়ে দিলেন জকোভিচ বা 'জোকার'। এতদিন জকোভিচের টেকনিকাল 'পাওয়ার হাউস' ছিল ফোরহ্যান্ড ক্রসকোর্ট ও 'উইনার ভলি'। এবার মেলবোর্নে দেখা গেল তার র‍্যাকেট থেকে বুলেটের গতিতে ছিটকে বেরোচ্ছে 'ব্যাকহ্যান্ড ডাউন দ্য লাইন ডিভাইস শট। নাদালের নৈপুণ্য বেসলাইনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে লম্বা র‍্যালিতে ক্লান্ত করে পয়েন্ট সংগ্রহ করা। সেই অস্ত্রকে ভোতা করে দিলেন জোকার কোর্টের দু'প্রান্তে রাফালকে ক্রমাগত দৌড় করিয়ে জমি ধরিয়ে। কেভিন অ্যান্ডারসন, উইলফ্রেড সাঙ্গা, জন ইসনারের মতো টুর সার্কিটে প্রায় সাতফুট দৈত্যসদৃশ সব খেলোয়াড় গত উইমবলডনের পর থেকে জোকারের সামনে বশ্যতা স্বীকার করে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছেন। জোকারের খেলায় এত নিখুঁত সংমিশ্রণ ঘটেছে শিল্প ও শক্তির যে শেষ তিনটি গ্র্যান্ডস্লামে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে জয়পতাকা উড়িয়েছেন তিনি। ক্রোয়েশিয়ার মেগাতারকা মারান চিলিচ সার্কিটে জোকারের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। তার অভিমত 'জোকার' যেভাবে এগিয়ে চলেছেন, তাতে ফেডেরারের ২০টি গ্র্যান্ডস্লাম জয়ের রেকর্ড ভেঙে দেওয়া অসম্ভব নয়। ৩২ বছর বয়স জকোভিচের। আরও পাঁচ-সাত বছর স্বচ্ছন্দে খেলে যাবেন তার দেহ-মন-আত্মার সুষম ভারসাম্যের দৌলতে। তাই জেকার অন্য গ্রহে ঢুকে পড়বেন।

সার্বিয়ার জকোভিচের পড়শি দেশের আর এক 'জিনিয়াস' একের পর এক অবিশ্বাস্য কীর্তি স্থাপন করে চলেছেন। নরোয়ের সুপার গ্র্যান্ডস্লাম মাস্টার ম্যাগনাস কার্লসেন যেসব কাণ্ডকারখানা দেখাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে তিরিশ বছর পূর্ণ করার আগেই বোধহয় গ্যারি কাসপারভ, আলেক্সি আলেখিন, ববি ফিশার, বিশ্বনাথন আনন্দকে টপকে যাবেন বিশ্ব খেতাব জয়ের সাপেক্ষে। ইতিমধ্যেই চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছেন। এর মধ্যে দুবার আনন্দকে হারিয়ে। আর সম্প্রতি ইতালির কাবিয়ানো কারুয়ালাকে ১২টি রাউন্ডের লড়াইয়ে হারিয়ে চতুর্থবার খেতাব জিতেছেন। তবে এবার জিততে তাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। 'সুপার টাইব্রেকে' খেতাবি লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে। কার্লসেন ওপেনিং, মিডল-অ্যান্ড গেমে সমান শক্তিশালী। তাই গত এক দশক ধরে বিশ্বদাবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ববি ফিশারের 'আই কিউ' লেভেল (১৮০) মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন, কালজয়ী সাহিত্যিক-নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের থেকে বেশি। কার্লসেনের আইকিউ এই সময়ের সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক বিজ্ঞানী- দার্শনিকের থেকে বেশি। কয়েক বছর আগে এই বিস্ময়ের প্রতিভার চাপে মাত হয়ে গেছে আইবিএম সুপার আল্ট্রা কম্পিউটার। আর সম্প্রতি বিশ্বের সেরা কয়েকজন সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীকে কার্লসেনের উল্টোদিকে বোর্ডে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাকে বলে সাইমাল টেনিয়াস দাবা। প্রত্যেকেই ১৫/২০ চালে কুপোকাত হয়ে যান। কিংবদন্তী সুপার জিএম গ্যারি কাসপারভ তার বইয়ে বলেছেন বিজ্ঞানসৃষ্ট সুপার মেশিন যতই শক্তিশালী হোক তা কার্লসেনের মতো জিনিয়াসের উৎকর্ষ মেধা মননশীলতার কাছে ছেলেমানুষ। তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনো যন্ত্র বা মানুষ নেই। এ এক মহাজাগতিক প্রতিভা। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

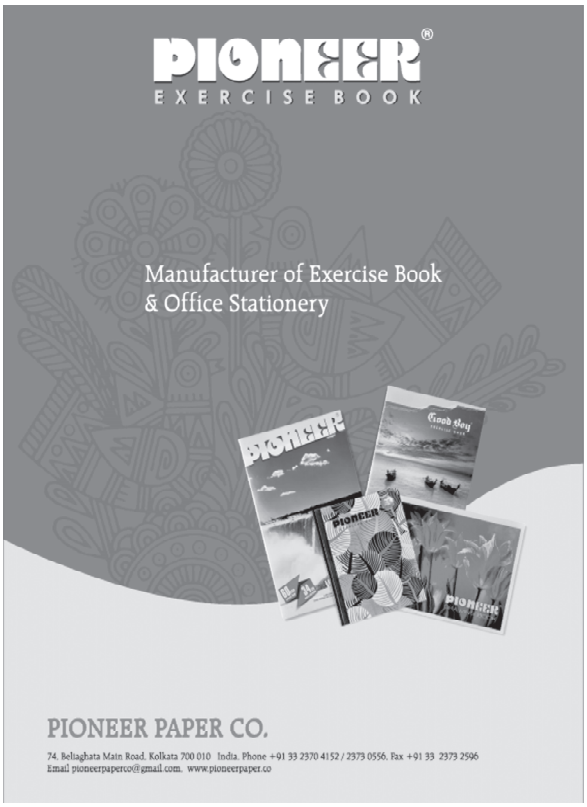

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

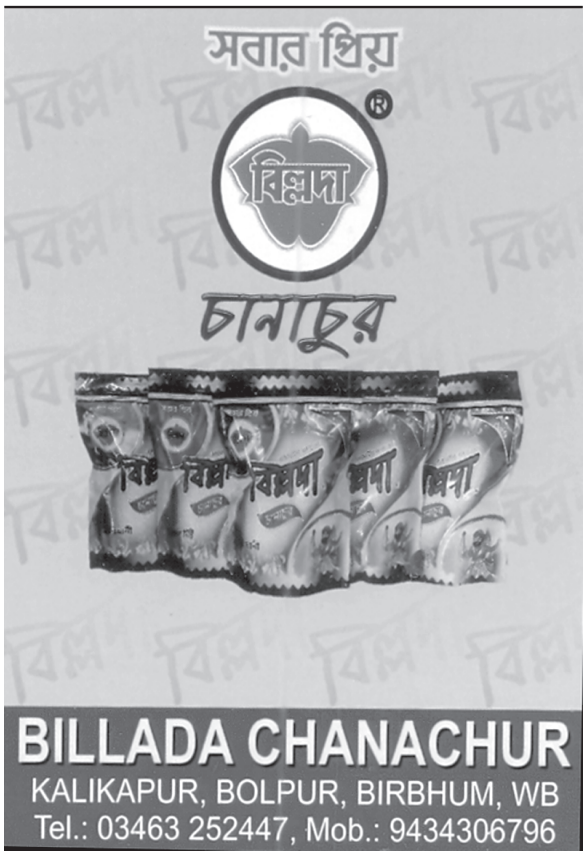

সমাজবাদী ঘরানার জাতীয়তাবাদী নেতা

জর্জ ফার্নান্ডেজ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি চলে গেলেন সমাজবাদী ঘরানার এক সময়ের আপোশহীন নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ। তাঁর রাজনৈতিক জীবন গড়পড়তা রাজনীতিবিদদের থেকে বরাবরই ছিল আলাদা। ব্যক্তি জীবনেও চেনা রাস্তায় চলাটা তাঁর পছন্দের ছিল না। ১৯৩০ সালে ম্যাঙ্গালোরে জন্মানো জর্জকে তাঁর বাবা ১৬ বছরেই ম্যাট্রিক (চার্চের অধীনে) পাশের পর যাজক হতে ব্যাঙ্গালোরে পাঠান। পাদরির উপদ্রবহীন জীবন কাম্য ছিল না ফার্নান্ডেজের। কিছু না জানিয়েই চলে এলেন মুম্বই। সেখানে দিন কাটানো নিয়ে নানান উপভোগ্য গল্পে যাওয়ার দরকার নেই। কাজের খোঁজ করতে করতে পেয়ে গেলেন ঠিকে প্রুফ রিডারের চাকরি। চার্চে থাকতেই আচার সর্বস্ব পাদরিদের আড়ম্বরময় জীবন ও আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার তাঁকে বিদ্রোহী ও ধর্ম-বিমুখ করে তোলে। এই বিমুখতা আজীবন বজায় ছিল।

মুম্বইয়ে সেই সময় ছোটোখাটো রেস্তোরাঁ, হোটেল, মোটর গ্যারেজের কর্মীদের দুরবস্থা তাঁকে খুবই কষ্ট দিত। এদের সঙ্ঘবদ্ধ করেই তিনি লড়াই শুরু করেন। মালিকপক্ষের সঙ্গে হাতাহাতি মারামারিতে তাঁর প্রায়শই জেল হতো। কিন্তু শ্রমিকনেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি বেড়ে যায়। সকলেই জানেন সেই সময়কার মুম্বইতে প্রতিষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট নেতা ছিলেন ডি মেলো, সিপিআইয়ের শ্রীপাদ ডাঙ্গে প্রমুখ। এদের মাঝখানে থেকেই তরুণ ফার্নান্ডেজ ট্যাক্সি চালকদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর বরাবরের ইস্তিরিহীন কুর্তা পাজামার অনাড়ম্বর পোশাক, সহজ ব্যবহার, আন্তরিকতা বহু ভাষা জ্ঞান তাঁকে মুম্বইয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবহণ কর্মীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। তাঁর এক সময়ের সহকর্মী বর্তমান সাংসদ রামবিলাস পাশোয়ান লিখেছেন সত্তরের দশকে একবার মুম্বইতে পৌঁছে তিনি ট্যাক্সি চালকদের চাক্কা জ্যামে পড়েন। বুদ্ধি করে তাদের কাছে জর্জের বন্ধু বলায় নিমেষে তারা তাঁর দলবলকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়ে তিনি ১৯৬১ থেকে ৬৮-তে ছিলেন মুম্বই মিউনিসিপাল নিগমের সদস্য। কিন্তু তাঁর পরিসর ছিল আরও বড়ো। সংযুক্ত সোশালিস্ট দলের লোকসভা প্রার্থী হিসেবে তিনি মুম্বই দক্ষিণ কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতা এম কে পাটিলকে হারিয়ে লাইমলাইটে চলে আসেন। সে সময় স্বাধীনতার পর রেল কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। জর্জ রেলওয়ে মেন ফেডারেশনে যোগ দিয়ে সম্পাদক থেকে সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন।

রেলকর্মীদের দাবি দাওয়া নিয়ে ১৯৭৪ সালের মে মাসে তিনি ধর্মঘট ডাকলেন। প্রারম্ভে অনেক কাজেরই পরিণতি আন্দাজ করা যায় না। ঐতিহাসিক এই ধর্মঘট চলেছিল ২০ দিন। সমগ্র দেশ হয়েছিল স্তব্ধ। অন্তর্কলহে ধর্মঘট ভেঙে গেলেও দেশব্যাপী ফার্নান্ডেজ সহ ৩০ হাজার জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। প্রমাদ গুনেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সমসাময়িকরা জানিয়েছিলেন এই উত্তাল পরিস্থিতিই তাঁকে জরুরি অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়ার অন্যতম কারণ।

গান্ধী পরিবারের সঙ্গে ফার্নান্ডেজের ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক। জরুরি অবস্থায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আত্মগোপনের সময় তাঁর খোঁজ পেতে ভাই লরেন্সকে ধরে জেলে অকথ্য

> জর্জের বরাবরের ইস্তিরিহীন কুর্তা-পাজামার অনাড়ম্বর পোশাক, সহজ ব্যবহার, আন্তরিকতা, বহু ভাষাজ্ঞান তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

ফঃ ৬

অত্যাচার চালানো হয়। বিখ্যাত কন্নড় অভিনেত্রী স্নেহলতা রেড্ডির হাঁপানি ছিল, তাঁকেও ৮ মাস জিজ্ঞাসাবাদ করে ফার্নান্ডেজের হদিশ না পেয়ে অত্যাচার বাড়ানো হয়। মুক্তি পাওয়ার পরই তিনি মারা যান। কথাগুলো বলেছেন লালকৃষ্ণ আদবানী (My Country my life p. 244)। চ্যানেল সঞ্চালক রজত শর্মাকে তিনি অকপটে বলে গেছেন সোনিয়া মিথ্যেবাদী, তিনি কখনও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি। কদিন আগে রাহুল গান্ধীকে পারিকর প্রসঙ্গে স্মৃতি ইরানি বলেছেন 'he is a Congenital (জন্মসূত্রে) lier' —ব্যাপারটা খাপ খেয়ে যায়।

জরুরি অবস্থার সময় তাঁর জেলবন্দি ছবি দেশময় তোলপাড় হয়েছিল। ম্যাঙ্গালোরে জন্ম, মুম্বইয়ে কর্মক্ষেত্র, নির্বাচনে লড়বেন বিহারে। ১৯৭৭-এ কয়েক লক্ষ ভোটে মজফ্‌ফরপুর থেকে জিতে জনতা সরকারের উদ্যোগ মন্ত্রী হয়ে আক্ষরিক অর্থে বহুত্ববাদী ভারতের প্রতিনিধি জর্জ প্রশাসনের ইনিংস শুরু করলেন। জরুরি অবস্থা পরবর্তী ৭৭-এর নির্বাচনে সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে একত্রে জনতা পার্টি হিসেবে লড়ার ক্ষেত্রে জর্জের বর্ণময় চরিত্রের বড়ো ভূমিকা ছিল। দেশের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের সভাস্থলগুলিতে সভার আগেই মানুষের কোনো ক্ষতি না করে সেখানে ছোটোখাট ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সভা বানচাল করার চক্রান্তে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। এক সময়ের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বীরেন শাহ তাঁর কোম্পানির বরোদার হালোল খনি থেকে ডিনামাইট স্টিক সরবরাহের খোঁজ দেন। তাই এটি 'বরোদা ডিনামাইট' কেস হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিল। জরুরি অবস্থার মধ্যগগনে ১৯৭৬-এ এই অভিযোগেই জর্জ গ্রেপ্তার হন।

ষাট ও সত্তর এর দশকে কমিউনিস্ট ও সোসালিস্ট দলগুলির রমরমা ও মার্কিন বিরোধিতা চূড়ান্ত ছিল। জর্জও তার বাইরে ছিলেন না। তাঁর নির্বাচনীকেন্দ্র মজফ্‌ফরপুরে গিয়ে জলাভাবের অভিযোগ শোনার পর সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলেন। একগ্লাস কোকাকোলা দিয়ে উদ্যোগমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন ভদ্রলোক। ক্ষেপে গেলেন জর্জ। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল কোকাকোলা আর আই বি এম কোম্পানির ভারত থেকে পাততাড়ি গোটানোর। তাঁর রাজনৈতিক গুরু রামমনোহর লোহিয়ার প্রভাব তখন একেবারে তাজা।

১৯৮০-তেই পতন হলো জনতা সরকারের। কিন্তু জর্জের ইন্দিরা ও পারিবারিক শাসন বিরোধিতায় কোনো ছেদ পড়ল না। ১৯৮৯ সালে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের নেতৃত্বে বোফর্স বিরোধিতার আবহে কেন্দ্রে আবার সরকার বদলে রেলমন্ত্রী হলেন ফার্নান্ডেজ। অতি অল্প সময়ে কোঙ্কন রেলপথের সূচনা করে গিয়েছিলেন তিনি।

খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। বাজপেয়ীর (১৯৯৯-২০০৪) সরকারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে অসংখ্যবার গেছেন তুষারাবৃত সিয়াচীন সীমান্তে। সফরে বরফ কাটার যন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নজর করেছিলেন। মন্ত্রকে দীর্ঘদিন ফাইল আটকে আছে শুনে দপ্তরের তিন বড়ো আমলাকে বিশ্বের উচ্চতম ও শীতলতম যুদ্ধ সীমান্তে সরেজমিনে অভিজ্ঞতার জন্য সটান বদলি করে দেন। একইসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও নিবিড় সহমর্মিতা পোষণের কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেনাবাহিনীর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। বারবার সিয়াচীন যাত্রার সু-সংস্কৃতির প্রবর্তক ছিলেন এই প্রতিরক্ষামন্ত্রী । তাঁকে বলা হতো decisive defence minister।

তবে তাঁর মন্ত্রিত্বের সময়টিতে পোখরানে পরমাণু পরীক্ষার গৌরব যেমন আছে, তেমনই রয়েছে বন্দি (বিমান ছিনতাই) প্রত্যার্পণ থেকে সংসদ আক্রমণের মতো মর্মান্তিক ঘটনা। ভাগ্যের পরিহাসে সফল কার্গিল যুদ্ধের পর উন্মত্ত পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাসি হামলা বাড়াতে থাকে। এদিকে বরাবরের মতো শহিদ সেনাদের জন্য কেনা কফিন নিয়ে ফার্নান্ডেজ দুর্নীতি করেছেন বলে কংগ্রেস সংসদ উত্তাল করতে শুরু করে। তখন আওয়াজ ছিল 'কফন চোর গদি ছোড়'। হৈ হট্টগোলে ১৩।১২।২০০১ -এর অধিবেশন বানচাল (দুই সভারই) হয়ে যায়। সেই দিনই সংসদে বিস্ফোরণ ঘটে। নিরাপত্তা রক্ষীদের মরণপণ সংগ্রামে সংসদ ও সাংসদরা অক্ষত ছিলেন। যদিও মুলতুবির কারণে সাংসদ সংখ্যা ছিল কম। এরপরই কেলেঙ্কারির অভিযোগে ব্যথিত জর্জ ইস্তফা দেন। মনে পড়বে সেই সময় আমাদের দিদিমণিও এই অছিলায় মন্ত্রীসভা ছেড়ে ছিলেন। অল্প সময়েই সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণিত হয়ে তিনি মন্ত্রীসভায় ফিরে আসেন। ২০০৪ থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে স্বাস্থ্যের কারণে যবনিকা নামে।

তবে, ভারত ইতিহাসকে একটি কলঙ্কজনক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর গৌরব জর্জকে না দিলে নিশ্চিত অবিচার হবে। ১৪ এপ্রিল ১৯৯৯-এ মাত্র ১টি বিতর্কিত ভোটে (গিরিধর গোমাঙ্গ) বাজপেয়ী সরকার (২৬৯-২৭০) পতনের পর ক্ষমতালিপ্সু সোনিয়া রাষ্ট্রপতির কাছে সরকার গঠনের দাবি জানান। তিনি মুলায়ম সিংহের সমর্থন পকেটস্থ ধরে নিয়েছিলেন। ক্ষিপ্ত ফার্নান্ডেজ খবর পেয়ে তাঁর এই পুরনো সমাজবাদী সহকর্মীর সঙ্গে শীঘ্র যোগাযোগ করেন। আদাবানীকে লেখা তাঁর চিঠিটি এরকম : 'Lalji, I have firm Commitment from my friend that his 20 MP's will not, under any circumstance, support Sonia Gandhi's bid to prime munister. I have brought him to meet with you so that you can be sure of this' মুলায়ম কথা রেখেছিলেন, সোনিয়া ব্যর্থ হন। শুধু এই কাজটির জন্যই স্বদেশ প্রেমিক, নির্ভীক, অতুলনীয় বাগ্মী ফার্নান্ডেজ জাতীয়তা-বাদীদের কাছে চিরস্মরণীয় হওয়ার ক্ষমতা ধরেন। ■

মালদহে কন্যাশ্রীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অবাধে চলছে বাল্যবিবাহ

তরুণ কুমার পণ্ডিত

আজ একুশ শতকে এসেও কি আমরা বলতে পারি আমাদের রাজ্যের মেয়েরা সবাই শিক্ষিত হচ্ছে কিংবা সুস্থ সবল মায়ের পুষ্ট ও সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করছে? এই লক্ষ্য পূরণের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা বাল্যবিবাহ। ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, বাল্যবিবাহে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। আবার পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মালদা জেলায় সর্বাধিক বাল্যবিবাহ, ৪২ শতাংশ যা খুবই উদ্বেগজনক। বাল্যবিবাহের উদ্বেগজনক পরিণতি যেহেতু পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর, সেহেতু এটি বন্ধ করার উপায় অবশ্যই বের করতে হবে।

মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার চাষপাড়া গ্রাম। পাড়ায় বিয়ের আসর বসেছে। চারিদিকে সাজো সাজো রব, উৎসবের আমেজ। কিন্তু পাত্রী যে নাবালিকা! খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হাজির। ১৪ বছরের ওই নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বিয়ে বন্ধ করে তার বাবার কাছ থেকে মুচলেকাও নেয় পুলিশ। কিন্তু বিয়ে বন্ধের পরেও প্রশ্ন থেকেই যায়। মুচলেকা নেওয়ার পরেও কিছুদিন বাদে যে চুপচাপ সেই মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হবে না, তার নিশ্চয়তা কি পুলিশ ও প্রশাসন দিতে পারবে? বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। এমন বহু বাল্যবিবাহের খবর আছে, যেখানে প্রশাসন থেকে বিয়ে বন্ধ পর আবার সেই মেয়ের সেই ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজে দেখা যায় 'নাবলিকার বিয়ে রুখল প্রশাসন'। তারপর ওই পরিবারটি ফের সেই নাবালিকার বিয়ে দিচ্ছে কিনা, তার খোঁজ কি পুলিশ প্রশাসন রাখছে? মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামীণ মুসলমান এলাকার স্কুলগুলিতে সরকারের সাধের কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নাবালিকার বিয়ে চলছেই। মালদা জেলার ৮ থেকে ১০টি স্কুলের খবর জানি, যেখানে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত উঠতে উঠতে ৪০ শতাংশ ছাত্রীর ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাল্যবিবাহের হার বেশি। প্রচুর ধরপাকড় হয়েছে, সমীক্ষা হয়েছে কিন্তু বাল্যবিবাহের হার কমেনি। পূজার ছুটি কিংবা গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুললেই জানা যায়, ছয়-সাত জন ছাত্রী যারা সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করত তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রীর বিয়ের খবর খুবই দুঃখজনক।

মনে প্রশ্ন জাগে, বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তাদেরকে সন্তান প্রসবের দিকে ঠেলে দেওয়া কি তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়? গ্রামের মানুষ অনেকেই এখনও তাদের কন্যা সন্তানকে 'বোঝা' বলে মনে করে। দেখা গেছে, দরিদ্র পরিবারগুলোতে ৫-৬টির কমে কোনো সন্তান নেই। সেখানে মেয়ে ১৩-১৪ বছর পার হতে না হতেই তাদের বিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে চায়। কেননা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি পাঁচ ছয়টি সন্তানের পিতা, এতবড়ো পরিবারের ভরণ পোষণ চালাতে হিমশিম খেতে হয়। মালদা শহর থেকে মাত্র আড়াই তিন কিলোমিটার দূরে যদুপুর, গাবগাছি, সোনাতলা, নাগরপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে গেলেই চোখে পড়বে অল্প বয়সী মেয়েদের, যখন তাদের শরীর গঠনের সময়, সেই বয়সে তারা পড়াশোনা বন্ধ করে ছেলে কোলে নিয়ে সংসারের ঘানি টানছে। এইভাবে কত কিশোরী যে অকালে মা হয়ে যাচ্ছে, কে তার হিসেব রাখবে। এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পঞ্চায়েতের ভূমিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে তারা ভোট হারাবার ভয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মৌলবি ও কাজিদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এক বিরাট হাত রয়েছে। কিন্তু সেখানেও ধর্মীয় গোঁড়ামির বাইরে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন না। শরিয়তি মতে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক। আমার স্কুলে কোনো ছাত্রীর বিয়ের খবর পেয়ে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয় না। কেননা নাম ঠিকানা নিয়ে চাইল্ড হেল্প কেয়ারের আধিকারিকরা ওই পরিবারটির সঙ্গে যোগাযোগ করে আসার পরপরই যথারীতি বিয়ে হয়ে যায়। কিছুদিন আগে মালদা মেডিক্যাল কলেজে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তদন্ত করে দেখা গেছে বেশিরভাগ নাবালিকা মায়েরই অপুষ্ট সন্তান সেই তালিকায় রয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিয়ে আরেকটি বিষয়ে সরকারের ও মিডিয়ার অসম্পূর্ণতা ও দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। দেখা গেছে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষা চলাকালীন বা সেই সময়ে ছবি সহ ছাত্রীদের সন্তান নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়। দেখানো হয় কষ্টের মধ্যে থেকেও সে পরীক্ষায় বসেছে। এতে করে কি বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে না? দেশে মা ও শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করতে হলে কিংবা পণের বলি থেকে মুক্তি পেতে বাল্যবিবাহ অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। তাছাড়া এটিও দেখা দরকার যে, এই বাল্যবিবাহ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা এবং জন বিন্যাসের উপর কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা। পরিসংখ্যান বলছে, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুর জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য জেলার তুলায় অনেক বেশি এবং তার জন্য বাল্যবিবাহের ফলে অধিক সন্তানের জন্মদান দায়ী। আইন প্রণয়ন করে এই কুপ্রথা বন্ধ করা যাবে না, প্রয়োজন সচেতনতার। কেবলমাত্র কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করা যাবে না। সরকার অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করুক এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে দূরদর্শন ও বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করুক, তাহলেই হয়তো এই জগদ্দল পাথরকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। ■

মায়ের নির্দেশ পুত্রকে, প্রতিজ্ঞা কর কখনও ঘুষ নেবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'দেখ বাছা, তুমি কী কাজ কর আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর কখনও ঘুষ নেবে না। কখনও কোনও পাপ করবে না।' কথাগুলো একদা বলেছিলেন একজন মা। তিনি একান্তভাবে চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র যেন সততার সঙ্গে দেশের কাজ করেন। এখনও সফল ও ব্যস্ত পুত্রের কানে গুঞ্জন তোলে কথাগুলো। বিশেষ করে সারা দেশের বিরোধী নেতারা যেখানে দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে সারদাকাণ্ডে সিবিআইকে নির্বিঘ্নে তদন্ত করতে দেবেন না এই সেদিন ধরনায় বসেছিলেন, সেই প্রেক্ষিতে বিচার করলে মা হীরাবাইয়ের কথাগুলো আজও নরেন্দ্র মোদীকে অনুপ্রেরণা জোগায়। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি খুব সুন্দরভাবে তাঁর অনুপ্রেরণা উৎসের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার মুখ্যমন্ত্রী হবার খবরে মা সব থেকে বেশি আনন্দ পেয়েছিলেন। শপথ নিয়েই আমি সোজা আমেদাবাদে মায়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম। মা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছ সেটাই সব থেকে আনন্দের ব্যাপার।' মায়ের স্নেহমমতার তুলনায় জীবনের কোনওকিছুই দামি নয়। যতই ঘাত-প্রতিঘাত নেমে আসুক মায়ের মন কখনও বদলায় না। সেই মন সবসময় সন্তানের মঙ্গল চায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমার প্রধানমন্ত্রী হবার খবর শুনে মায়ের কেমন লেগেছিল? আমি তাদের বলি মা খুব স্বাভাবিক ভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিলেন। আসলে আমার নাম তখন মোটামুটি অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, পত্রপত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হতো, আমাকে ঘিরে বেশ একটা উত্তেজনা ছিল। কিন্তু যেবার প্রথম আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হই তখন আমি ততটা বিখ্যাত ছিলাম না। মায়ের কাছে ঘটনাটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেবারই মা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, যাতে আমি কখনও ঘুষ না নিই। যাতে কখনও কোনও পাপ না করি। কিন্তু পুত্র যদি মুখ্যমন্ত্রী না হতে পারতেন তা হলে কি মায়ের ভালো লাগত? মাকে নিয়ে গর্বিত পুত্র বলেন, 'আমার মা একটু অন্যরকম। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এসব ছাড়ুন। আমি যদি গিয়ে বলি, মা আমি একটা সাধারণ চাকরি পেয়েছি, তাহলেও মা পাড়াপড়শিদের মিষ্টি খাওয়াবেন।' নরেন্দ্র মোদীর স্মৃতিচারণ শুনে মনে হয় নেপোলিয়নের কথাই সত্যি। ভালো মা না হলে ভালো সন্তান হয় না। অর্থাৎ হীরাবাইয়ের মতো মা না হলে নরেন্দ্র মোদীর মতো সন্তান হয় না।

বিজয় মাল্যকে প্রত্যর্পণের আবেদনে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিবের সায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিজয় মাল্যকে কি এবার দেশে ফেরানো যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর এতদিন অনিশ্চয়তার আড়ালে ঢাকা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র সচিব সাজিদ জভিদ কিংফিশার এয়ারলাইন্সের মালিককে ভারতের হাতে তুলে দেবার আবেদনে সায় দেওয়ায় অনিশ্চয়তা অনেকটাই কেটে গেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর আগে বিজয় মাল্য ইডির দাখিল করা প্রত্যার্পণের আবেদনের বিরুদ্ধে মামলা করে বিজয় মাল্য ব্রিটিশ কোর্টে হেরে যান। ব্রিটেনে আশ্রয় নেওয়া কোনও ব্যক্তিকে তার নিজের দেশে বা অন্য কোনও দেশের হাতে তুলে দেওয়ার নিয়মকানুন অনুসারে, চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের একটি কপি স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। প্রত্যার্পণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র সচিবের ভূমিকা ব্রিটেনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এরপরেও একটা ধাপ থেকে যায়। বিজয় মাল্য চাইলে ১৪ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট স্বরাষ্ট্রসচিবের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন। না করলে তাকে স্বরাষ্ট্রসচিব নির্দেশ দেওয়ার ২৮ দিনের মধ্যে ভারতে ফিরে আসতে হবে। বিজয় মাল্য জানিয়েছেন তিনি আপিল করবেন। তবে আপিল করলেও যে বিশেষ লাভ হবে না সেটা তিনি জানেন। কতকটা সেই কারণেই কিছুদিন আগে তাঁর আইনজীবীরা কর্ণাটক হাইকোর্টে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, আদালত সম্মতি দিলে তিনি সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত ঋণ শোধ করতে চান। ব্যাঙ্কের কাছে নথিবদ্ধ সম্পত্তি ছাড়াও বিজয় মাল্যর ১৩,৯০০ কোটি টাকার সম্পত্তি আছে বলে তার আইনজীবীরা দাবি করেন। যাইহোক, তিনি সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণশোধ করুন অথবা সশরীরে দেশে ফিরে এসে বিচারের মুখোমুখি হোন— দুটো ঘটনাই যে মোদী সরকারের সাফল্য সুচিত করে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের বদান্যতায় বিজয়মাল্য বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছিলেন।

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা-প্রত্যাহার জল মাপছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আফগানিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত পাল্টানোয় ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল ভারত। পাসতুন হোক বা হাজারা কিংবা তাজিক, আফগানিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারত। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে মার্কিন প্রশাসন। আফগান রমণীরা ভয় পাচ্ছেন যে তালিবানের সঙ্গে সমঝোতায় সেদেশ থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হলে আফগানিস্তানে ফের জাঁকিয়ে বসবে তালিবানি শাসন এবং মেয়েদের ওপর আবার শুরু হবে অকথ্য অত্যাচার। বস্তুত সমগ্র বিশ্বের কূটনৈতিক মহলই মনে করেন আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে আসলে সুবিধা করে দিচ্ছে তালিবানদেরই।

ওই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান বিষয়ে বিদেশ নীতিতে কিছু জরুরি পরিবর্তন আনছে ভারত। আগেও ভারত বলেছে তালিবানদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা নয়, কোনও পরিস্থিতিতেই। এই নীতি থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও কোনওমতেই সরছে না ভারতের বিদেশমন্ত্রক। সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সেদেশে যে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সম্পদের বিনিয়োগ রয়েছে, সেগুলি সুরক্ষিশ্রত করাই আপাতত এদেশের প্রশাসনের প্রাথমিক লক্ষ্য। যে কারণে বিভিন্ন আফগান-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে চাইছেন এদেশের কূটনীতিকরা।

গত নভেম্বরে ভারত আফগানিস্তানের এই ঘোরাল পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল

তার দুই প্রাক্তন কূটনৈতিক টিসিএ রাঘবন (পাকিস্তানে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত) এবং অমর সিংহ (আফগানিস্তানে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত)-কে পাঠায় আলোচনার টেবিলে, রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত মস্কো-ধাঁচের কথোপকথনে যেখানে সমঝোতার মুখোশ পরে থাকা তালিবানেরাও ছিল। যদিও সরকারিভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব এই বৈঠকে ছিল না, কিন্তু দু'জন প্রাক্তন দক্ষ কূটনীতিককে পাঠিয়ে জল মেপে নিতে চাইল ভারত। বর্তমান আফগান-প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক দীর্ঘদিনের, শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে কারজাইয়ের সদর্থক ভূমিকায় দু' তরফের বন্ধুত্বই সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিল্লি আফগানিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী যেমন আমেরিকা, রাশিয়া ছাড়াও ইরান ও অন্যান্য মধ্য এশীয় দেশের সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়েছে কিছুদিন ধরেই। চীনা মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গেও আলোচনার দরজা খুলেছে ভারত। তবে পাকিস্তান আপাতত ব্রাত্যই। কারণ তালিবানদের সহযোগীর সঙ্গে কোনও আলোচনা চাইছেন না এদেশের কূটনীতিকরা।

মহিলারা খনিতে কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এখন থেকে মহিলারা খনিতে কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ পাবেন। ১৯৫২ সালের খনি আইনের ৮৩ (১) ধারাতে

উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের খনিতে কর্মসংস্থনের সুযোগ করে দিচ্ছে। এই আইনের ৪৬ নম্বর ধারায় মহিলাদের খনিতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কিছু বিধিনিষেধ ছিল, যা বাতিল করা হয়েছে। খনিতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খনি মালিকরা নির্দিষ্ট সময়াকালের জন্য মহিলাদের খনি এলাকায় যেমন ওপেনকাস্টে (সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) বা খনির মধ্যে (সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত) কাজে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তিনজন বা তার বেশিজন মহিলাকে এক সঙ্গে খনিতে কাজের জন্য পাঠানো যাবে। এছাড়া, মহিলা কর্মীদের লিখিত মত আদায় করেই তাঁদের এই কাজে পাঠানো হবে। মহিলাদের খনিতে কাজ করার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর নজর রেখেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও বলা হয়েছে। খনি আইন প্রসঙ্গে মহিলাদের ১৯৫২ সালের খনি আইনে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত মহিলাদের কাজের অনুমতি দেওয়া হতো না। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকে মহিলাদের খনিতে কাজের সমান সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ পাওয়ায় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র, মহিলা ও শিশু বিকাশ, খনি, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সরকার সন্ত্রাসবাদের যোগ্য জবাব দেবে : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে যারা সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে, সরকার তাদের যোগ্য জবাব দেবে। শ্রীনগরে ২ ফেব্রুয়ারি এক জনসভায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা প্রত্যেক জঙ্গিকে উপযুক্ত জবাব দেব। আমরা জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের শিরদড়া ভেঙে দেব এবং আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।'

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ উৎসর্গকারী শহিদ নাজির আহমেদ ওয়ানির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''শহিদ নাজির আহমেদ ওয়ানি সহ সমস্ত সাহসী সৈনিক, যাঁরা দেশ এবং শান্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা।'' উল্লেখ করা যেতে পারে, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য নাজির আহমেদ ওয়ানিকে সর্বোচ্চ

সাহসিকতা পুরস্কার 'অশোক চক্র' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা জম্মু-কাশ্মীরের যুবসম্প্রদায়-সহ সমগ্র জাতিকে দেশের স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

এরপর, প্রধানমন্ত্রী নব-নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রাজ্যে বেশ কয়েক বছর বাদে স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন হওয়ায় তিনি খুশি বলে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন। প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যায় ভোটদানের জন্য তিনি সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এটা থেকে প্রমাণিত হয়, গণতন্ত্রের প্রতি এখানকার মানুষের আস্থা যেমন রয়েছে, তেমনই রাজ্যের উন্নয়নেও তাঁদের আগ্রহ রয়েছে।

এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমি এখানে ৬ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনের জন্য এসেছি। শ্রীনগর ও আশপাশের অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।''

টেলিভিশন দর্শকদের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (ট্রাই) ২০১৭-র মার্চে সম্প্রচার এবং কেব্‌ল পরিষেবার জন্য একটি নতুন নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ২০১৮-র ৩ জুলাই এটি কার্যকর করার জন্য সময়সূচি জানানো হয়। এই সময়সূচি অনুসারে সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারীকে ২০১৮-র ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে, গ্রাহকদের সুবিধার কথা ভেবে কর্তৃপক্ষ এই সময়সীমা ২০১৯-এর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। নতুন এই ব্যবস্থায় কেব্‌ল টেলিভিশনের গ্রাহকরা তাঁদের ইচ্ছেমতো নির্দিষ্ট চ্যানেল দেখতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট চ্যানেলগুলির জন্য মাসিক চাঁদা দিতে হবে। যদিও অনেক গ্রাহক নতুন এই ব্যবস্থায় যাওয়ার জন্য লিখিতভাবে তাঁদের অপশন জানিয়েছেন, তবুও এখনও বেশ কিছু গ্রাহক এই কাজ করে উঠতে পারেননি। এইসব গ্রাহকদের কথা ভেবে পরিষেবা প্রদানকারীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত গ্রাহককে নতুন ব্যবস্থায় নিয়ে আসার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নতুন এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রাহককে প্রথম ১০০টি নিঃশুল্ক চ্যানেলের জন্য ১৩০ টাকা করে নেটওয়ার্ক ক্যাপাসিটি ফি দিতে হবে। অতিরিক্ত ২৫টি চ্যানেলের জন্য আরও ২০ টাকা করে দিতে হবে। তবে, কোনো পরিষেবা প্রদানকারী দ্বিতীয় কেবল সংযোগের জন্য, ইচ্ছা করলে এর থেকেও কম নেটওয়ার্ক ক্যাপাসিটি ফি দিতে পারবেন। গ্রাহকরা চ্যানেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এ বিষয়ে কোনো পরিষেবা প্রদানকারী গ্রাহকদের স্বার্থ-বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নিলে ট্রাইয়ে কল সেন্টারে ০১২০-৬৮৯৮৬৮৯ নম্বরে ফোন করে অথবা das@trai.gov.in ঠিকানায় ই-মেল করে অভিযোগ জানাতে পারেন। কলকাতা হাইকোর্ট বিষয়টি নিয়ে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আদালতের স্থগিতদেশ ট্রাইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। যেসব গ্রাহক এখনও চ্যানেল পরিষেব সংক্রান্ত তাঁদের অপশন বা পছন্দের ব্যাপারে জানাননি, তাঁদের অবিলম্বে স্থানীয় পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে গ্রাহকরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে এক মাসের মধ্যে পছন্দের চ্যানেল অদল-বদল করতে পারবেন।

এ বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(১) অনিল কুমার ভরদ্বাজ, উপদেষ্টা-II (বিঅ্যান্ডসিএস), ট্রাই-০১১-২৩২৩৭৯২২, ই-মেল-advbcs-2@trai.gov.in।

(২) অরবিন্দ কুমার, উপদেষ্টা-I/III, (বিঅ্যান্ডসিএস), ট্রাই-০১১-২৩২২০২০৯, ই-মেল-arvind@gov.in।

ধর্ম ও বিজ্ঞান এবং শ্রীচৈতন্যদেব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভোগের জগৎ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, চৈতন্যের জগৎ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। চৈতন্যবিজ্ঞানের মতো মূল্যবান বিষয়ের স্বরূপসন্ধান পাচ্ছি না। এই যে অচৈতন্য অবস্থা, এই অচেনা ভারতবর্ষের সূচনা বৈদেশিক মুসলমান আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে। তা ভারতীয় সমাজের কোণে কোণে, প্রত্যন্ত অঞ্চলকে আবিষ্ট করে ফেললো। ভারতবর্ষ হয়ে উঠলো মৃতবৎ। তার প্রাণস্পন্দন নেই। একজন রোগী যখন সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ হয়ে পড়ে, কোমায় চলে যায়, মেডিক্যাল সায়েন্সে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। একইভাবে স্পিরিচুয়াল হাসপাতাল তৈরি করলেন শ্রীচৈতন্য। ভারতবাসীর মধ্যে সত্যিকারের চৈতন্য-বিকাশ ঘটালেন মহাপ্রভু। প্রায় পাঁচশো বছরের মতো সময়ের অসুস্থতা নিরাময়ের চেষ্টা করলেন তিনি। ১৪৮৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন সেই ডাক্তার।

১৫১০ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর ডাক্তারি পাশ করা হলো কাটোয়াতে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন এ যুগের ব্রজেন্দ্র নন্দন। নাম হলো 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। অর্থাৎ তিনি দেশবাসীর চৈতন্য এনে দেবেন। এনে দিলেন তাঁর পরিব্রাজন পর্বে (১৫১০-১৫১৫) এবং নীলাচল পর্বে (১৫১৫-১৫৩৩); তার শুভঙ্করী প্রভাব অব্যাহত রইলো। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধান; আজ থেকে ১৩২ বছর আগে চৈতন্য বিজ্ঞানের আসরে অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তিনি কল্পতরু হলেন, বললেন, 'চৈতন্য হোক', জীবনের পরম-প্রাপ্তি ঘটুক। মনে পড়বে শাক্ত-সংগীত, 'আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী'।

দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র, বহুরূপী। ভারতীয় সাধকেরা অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যও দৃষ্টিগোচর করেছেন; বিভিন্নতার মধ্যে যে শাশ্বত সাম্য আছে তা বোধগম্য করেছেন। ১৯১৭, বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভাষণ দিচ্ছেন, 'ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে।... বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী (পদার্থবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ববিদ্যা) সংগমেই সেই মহাতীর্থ।" বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্যের পুনরাবিষ্কার করলেন জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র (১৮৯৪) বলছেন, ''এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম অথবা আকাশ।" ভর-শক্তি-মহাশূন্যতা। পৃথিবীর সবচাইতে জনপ্রিয় যে সমীকরণ— স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটির বিখ্যাত পেপারে আইনস্টাইন দেখালেন— $E=mc^2$ ভর ও শক্তির সাম্যতা; ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র; শক্তির পরিমাণ = বস্তুর ভর × আলোর বেগের বর্গ। শক্তি এবং ভর সমতুল্য এবং পারস্পরিক পরিবর্তনযোগ্য। আপেক্ষিকতাবাদের জনক তিনি, আলবার্ট আইনস্টাইন।

হিন্দুশাস্ত্রে আমরা জেনেছি, আত্মা অবিনশ্বর, তার সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই, তাকে তরবারিতে খণ্ডন করা যায় না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না, বাতাস তাকে শুষ্ক করতে পারে না।

''নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।"

জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। পরমাত্মার জীবাত্মায় রূপান্তর ঘটে। পরমাত্মা থেকে জীবাত্মা সৃষ্টি হয়, জীবাত্মা পুনরায় পরমাত্মায় বিলীন হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনুপাত ধ্রুব বা কনস্টান্ট। এই পরমাত্মাকে যে যেভাবে খুশি মানতে পারেন; 'যত মত তত পথ।' স্বামীজীর মতো বলতে পারেন 'বড়ো আমি', রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারেন 'পাকা আমি', গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত অনুযায়ী তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শুদ্ধ আস্বাদন ভগবানই অনন্ত শক্তির অতি প্রকাশ। নির্বিশেষবাদীদের কাছে পরমব্রহ্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অনুসারে পরমাত্মার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ এবং জীবাত্মার প্রতীক শ্রীরাধিকা। যত লীলা-কীর্তন গ্রন্থ আছে সেখানে রাধাপ্রেমকে বড়ো দেখানো হয়েছে, রাধার প্রেম বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের প্রেম কমই বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ হলেন প্রেম দেবার সত্ত্বা, দাতা; রাধা হলেন প্রেম নেবার সত্তা, গ্রহীতা। আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী E-কে যদি M-এর সমান হতে হয় তবে একটা c^2 থাকতে হবে। এই c^2-টিই হলো ইমোশন— কোথাও ভগবৎ প্রেম, কোথাও ভগবৎ-সেবা, কোথাও কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি। জীবাত্মা বা ভর (mass)-এর প্রতীক শ্রীরাধিকায় কৃষ্ণপ্রেমের মতো ইমোশন যুক্ত হলেই তিনি পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হতে পারেন, হয়ে উঠতে পারেন Energy, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ভগবান এ বিশ্বের নিয়ন্ত্রক, কোনো ইমোশন নেই। জগদীশচন্দ্র লিখছেন, ''প্রকৃতিও কি ক্রূর নয়?... যাঁহার ইচ্ছায় অনন্ত বারিধি বাত্যতাড়নে ক্ষুব্ধ হয়, কেবল তাঁহার অজ্ঞাতেই জলধি শান্তিময়ী মূর্তি ধারণ করে।"

যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট হলেন— অন্তরে রাধা, বহিরঙ্গে কৃষ্ণ, তিনিও ভর-শক্তিতত্ত্ব, জীবাত্মা-পরমাত্মার তত্ত্ব নিজের জীবনেই অনুশীলন করলেন— এ এক অনুপম চৈতন্য বিজ্ঞানের কথা। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন দলে দলে মুসলমান ধর্মগ্রহণে তৎপর হয়েছে, তখন বর্ণহীন এক সমাজ তৈরির জন্য এক ধর্মীয়-সাম্যের বাণী বিতরণ করে, আচণ্ডালে হরিভক্তি প্রচার করে দক্ষ সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

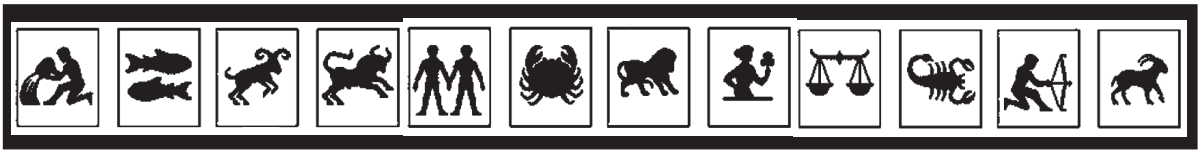

১১ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শুক্র-শনি, মকরে রবি-কেতু, কুম্ভে বুধ, মেষে মঙ্গল। বুধবার সকাল ৯-৪২ মিনিটে রবির কুম্ভে প্রবেশ।

মেষ : চিত্ত চাঞ্চল্য, সহোদরের সঙ্গে বৈষয়িক মতনৈক্য। বন্ধুপ্রিয়, শিল্পসৌন্দর্যের পূজারি, কাব্য ও শাস্ত্রজ্ঞ। কবি, লেখক, সাংবাদিক, বিচারকের কর্মে দক্ষতা ও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। বিসালবহুল শৌখিনতার জন্য খরচ। উচ্চাভিলাষ ও প্রণয়ীর কারণে ভাগ্যবিড়ম্বনা। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য, বিদ্যার্থীর সফল মনস্কাম ও পূর্ণ মূল্যায়ন।

বৃষ : শারীরিক সুস্থতা, সঠিক সিদ্ধান্ত, সমাজের সঙ্গে হৃদ্যতা, গৃহ ও বাহন যোগ। নতুন উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ। সহোদর ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে ব্যথিত হওয়ার সম্ভাবনা। পরোপকারী ব্যক্তিত্বের জন্য সাধুবাদ, সৃজনশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি যোগ। পুলিশ বা পাবলিক ঝামেলা থেকে বিরত থাকা শ্রেয়।

মিথুন : সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতি। স্বীয় প্রতিভায় সংগীত ও সাহিত্যের বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্মান ও পুরস্কার লাভ। এ সপ্তাহে ব্যবসার প্রসার ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। রিসার্চ ফেলো প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিজ্ঞানী, সার্ভেয়ারের সৌভাগ্য ও সম্মান। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও ভ্রমণ যোগ।

কর্কট : জটিল ব্যক্তিদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা ও ক্রোধ সংবরণের প্রয়োজন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহায়তা ও নিজ অধ্যবসায়ে সাফল্য ও মানসিক প্রশান্তি। কারও বিরূপ আচরণে পারিবারিক পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে। সন্তানের কর্মকুশলতা ও গবেষণামূলক কর্মে সাফল্য ও আনন্দ। পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের যোগ। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আইনি জটিলতা।

সিংহ : অতিরিক্ত বাগ্মিতা ও ব্যস্ততায় শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব সচেতনতায় কর্তৃপক্ষের শংসা প্রাপ্তি। পেশাদারদের পদোন্নতিতে স্থগিতাদেশ। সন্তানের মেধার বিকাশ, সামাজিক কল্যাণে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, বেকারত্বজনিত অবসাদ ও পারিবারিক সদস্য বৃদ্ধির যোগ। নতুন বিনিয়োগ না করাই ভালো। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

কন্যা : স্বজন বাৎসল্য, ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যায় সাফল্য, কুশল ব্যাখ্যাকারী, স্বজনশীল, দরদি ও অনুভবী মন। বিষয়-সম্পত্তি ক্রয়- বিক্রয় ও নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয় বৃদ্ধি। মধুর বাক্য প্রয়োগে বিরোধিতা হ্রাস। অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদে উৎফুল্লতা যোগ।

তুলা : জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, গৃহ ও বাহন, মিত্র হৃদ্যতা, সদ্ভাব, শ্রী ও উৎসাহ বৃদ্ধি। প্রয়োজনীয় কাজের সমাধা। ক্রয়-বিক্রয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আত্মীয়স্বজনের কথাবার্তায় স্বস্তি, ভ্রাতা-ভগ্নীর পদক্ষেপে সন্তোষ। সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষা লাভার্থে প্রবাস। স্ত্রীর সৌজন্যে বিনিয়োগের শুভ ফল প্রাপ্তি। সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব।

বৃশ্চিক : আয়, বিদ্যা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুকূল সপ্তাহ। প্রমোটিং, দালালি, পরিবহণ ও জলজ ব্যবসায় বিনিয়োগে প্রাপ্তি ক্ষেত্রে শুভ। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। রমণীর চাতুরিতে উদ্বেগ, গুরুজন স্থানীয় কারও কথা বিরক্তিকর মনে হতে পারে। সপ্তাহের প্রান্তভাগে পরিবারে নবজাতকের সম্ভাবনা। ক্রীড়াবিদ ও বাহন চালকদের শরীরের বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন।

ধনু : বস্ত্র, অলংকার, গৃহসজ্জা, বৈষয়িক সমৃদ্ধি, আভিজাত্য, রমণীর প্রতি দুর্বলতা, উদার হৃদয়ের প্রকাশ, প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ। স্বল্প পুজিতে ব্যবসার উদ্যোগের বাস্তবায়ন। স্ত্রীর জেদভাব পবিত্র মনকে কলুষিত করবে। গুরুজনদের দ্বিজে ভক্তি ও সৃষ্টির আনন্দে প্রত্যয়দীপ্ত পথচলা। যুবক বন্ধুর শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট- আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

মকর : স্ত্রীর শরীরের যত্ন ও কৌশলী চালচলনে উদ্বেগ। অবসাদ ও সময়ের অপচয়। বিদেশির সাহচর্যে জীবনে চলার পথে নতুন দিশার সন্ধান। নেতা-নেত্রীদের কারণে আইনি ঝামেলার সম্ভাবনা। পাওনা আদায়ে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কারণে কর্মপ্রকল্প স্থগিত ও বিরাগভাজন। সপ্তাহের শেষভাগে প্রতিকূলতার অবসান।

কুম্ভ : শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্যের পূজারি, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, অকৃত্রিম ভালোবাসার জীবনদর্শন। শিক্ষার আঙিনায় নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবন। বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ, বুদ্ধিমত্তা ও বাকচাতুর্যে শত্রুতা হ্রাস। সুধাময় দৃষ্টিতে জনকল্যাণে অংশগ্রহণ। নির্মাণশিল্প, খনিজ, অনুসন্ধান, শল্য চিকিৎসকের প্রতিভার বিকাশ। যশ-খ্যাতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা।

মীন : স্ত্রীর কর্মসংস্থান। বাড়ি-গাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি- রপ্তানি ব্যবসায় শুভ। সন্তানের চালচলনে আধুনিকতার পরশ ও চঞ্চলতা। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা ও গবেষণায় অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। অর্থনীতির পথ সংকুচিত হবে। সপ্তাহের প্রান্তভাগে অনুকূল পরিবেশ। স্বজন সহায়তা ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য